একালের কার্টুন



সম্পাদনা
কুমারেশ ঘোষ

গ্রন্থ গৃহ
৮এ. কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা ১৩৫০

প্রকাশক :
চন্দন ঘোষ
গ্রন্থ-গৃহ
৪৫-এ, গড়পা'র রোড
কলিকাতা-৯

০

মুদ্রক :
চন্দন ঘোষ
মন্মথ মুদ্রণী
৪৫-এ, গড়পার রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
চিত্ত সরকার

দাম : ২·৫০



অ-রসিকেষু—





।। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ।।

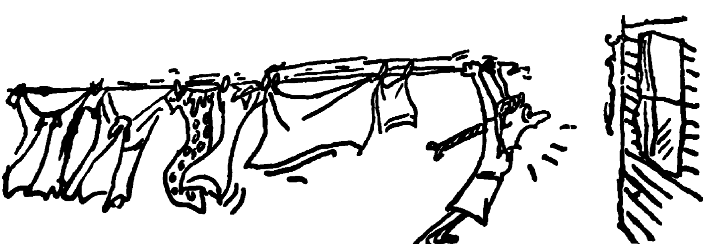
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রবুদ্ধ, দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল
যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা,
ভারতবর্ষ, দর্পণ, স্টেডিয়াম, মহিলা, যষ্টি-মধু

শেষপর্যন্ত তুলি-কারবারীদের তৈরী এই অতুলনীয় কাঁটাফুলের গুচ্ছ বাঁধা হলো। গুচ্ছটি তাজা ফুলেরই ; আজকালকার সাজানো বাগান থেকেই তোলা। বাঙ্গালী রসিক-সমাজ কাঁটার ভয় না করে ফুলের সৌরভটুকু সাগ্রহে গ্রহণ করতে পারলেই এ প্রচেষ্টা সার্থক।

আমা হেন এক কলমবাজের পক্ষে এ চেষ্টা হয়তো অনধিকার চর্চা। তবে আজকাল সব কিছুতেই অনধিকার চর্চা-ই রীতি। যে চেয়ারে যার বসবার কথা নয়, সে সেই চেয়ারেই বসে। নিজে নিরাপদে থেকে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোই একালীন আর্ট। আমার এ দুঃসাহস এই কারণেই।

লেখা ও রেখা দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের জানাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ। কারণ, অন্যথায় এই কষ্ট-কর্মটি 'অপকর্ম'-ই হ'য়ে দাঁড়াতো। আর 'ওমিও' ও অ-গুপ্ত-র দ্বৈত অমিয়ধারায় উৎসাহিত না হ'লে এই অপূর্ব গুচ্ছটি বাঁধা যেত কিনা সন্দেহ। বরং অনেক কিছু গচ্ছা দিয়ে গোপনে মাথা চুলকোতে হতো। এ আমার 'পিঠ-চুলকানো' কথা নয়।

—সম্পাদক।



যাঁদের নিয়ে গুচ্ছ



একালের কার্টুন



কাফীখাঁ

(জীবনের কয়েকটি ছোট ঘটনা)

'তুমি এই ছোট্ট ছেলেটাব বাস্তবদৃষ্টি ও তার রূপ দেবার চেষ্টার দিকে চেয়ে দেখ। কেমন সে পাতি গাঁদা ফুলের পাশের পাপড়িগুলো ফেলে দিয়ে ওটাকে দাড়ি কামাবার বুরুষ তৈবি কবেছে। আর তাই দিয়ে আমাব গালে বুলোচ্ছে, যেন সাবান মাখাচ্ছে দাড়ি কামাবে বলে। এই ছেলেটা ওদের দেশে থাকলে কত্তো বড়ো হতো। কিন্তু আনন্দ, তোমরা তো তা হতে দেবে না। তোমবা ওব পেন্সিল রবার রং সব ফেলে দিয়ে ওকে শুধু বই পড়ার দিকে ঠেলে দিয়ে শেষে একটা মাষ্টার বানাবে।' —বলেছিলেন 'ভারত বিলাপ' ও 'যমুনা লহরীর' কবি গোবিন্দ

রায় তাঁর ছোট ভাইকে (আমার মাতামহ) আমার ৫ বৎসর বয়সের পাগলামীর নমুনা দেখে।

সে প্রায় স্বদেশী আন্দোলনেরও আগে সাঁওতাল পরগণার কারমাটারের ঘটনা।

এতদিনে বিদেশ ঘুরে বুঝতে পারচি ওঁর কথাটা কত বড় সত্যি।

বড় অবস্থায় মানুষ হলে মনটা সরল থাকে; সেই সরলতার প্রায়শ্চিত্ত করা শিখেচি কলকাতায় আসার পর। সে প্রায় ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা।

লেখাপড়ায় খালি ফার্ষ্ট ক্লাস হলে মাষ্টারই হওয়া যায়। কিন্তু ছবি মানচিত্র, মডেল ও সঙ্গীতের দিকে অদম্য স্পৃহা থাকায় বোধহয় এতকাল পর তার সুফলটা দেখতে পাচ্চি। কলকাতায় আসার আগে ছিলাম ইতিহাস অনার্স ও ইকনমিকসের অধ্যাপক পুর্ববঙ্গের এক মফঃস্বল কলেজে। কিন্তু মনে তাতে সাড়া পেতাম না। তাইতো, শেষে আবার শুধু সেই পুরানো সিলেবাস মতই পড়াতে হবে বছরের পর বছর ধরে?

ছবি আঁকতাম অবসর সময়ে। আর এক সহকর্মীর বেহালাটা নিয়ে মাঝে-মাঝে বাজানোর চেষ্টা করতাম। তিনি বলতেন, আপনার হাত এত মিঠে! একটা বেহালা কিনুন না! বেহালা কেনা হলো, আর নিজেই তার শিক্ষক। সন্ধ্যার ক্লাসের পাঠ তৈরির পর বন্ধু সহকর্মীদের সঙ্গে বেহালা, ভারতীয় শিল্প ও মুসলমানী ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের চর্চা চলতো। পরে কলেজের ড্রামাটিক এসোসিয়েশনে ছাত্রদের রিহার্সাল, সঙ্গীত, ইত্যাদি।

সে ৩৩ বৎসর আগে। তারপর কলেজ ছেড়ে এই অজ্ঞাত লাইনে পাড়ি দিলাম যখন, তখন ছাত্রেরা ষ্টেশনে এগিয়ে দিতে এলো ছল্-ছল্ চোখে। স্যর, আপনি চলে গেলেন, আমাদের যা গেল, কলেজ কাণা হয়ে গেল, আমাদের কমনরুম গেল, ড্রামাটিক এসোসিয়েশন গেল, আমাদের 'দেশ' ও 'সুরট' রাগের তফাৎ বোঝাবেই বা কে, দক্ষিণী, হিন্দী, মুসলমানী ঢং-এর রূপই বা বলবে কে ইত্যাদি।

আমারও মনটা কেমন করে উঠলো। সত্যিই তো, এই

রকম ছাত্রভাগ্য কজনের হয় ? এখনও মনে হয়, অর্থ ব্যাপারে কিছুটা দারিদ্র্য থাকতে পারে, কিন্তু সেই কলেজে প্রাণ ছিলো। আর ছাত্রদের প্রাণে গান ছিলো, কেননা সেটা চিটাগাং আর্মারি রেড-এর সময়।

এবার কলকাতায়। কলকাতাই আমাকে চালাক করে দিলো। সে ১৯৩৩ সাল। নতুন লাইন তো ধরলাম, কিন্তু এতে পয়সা কোথায় ? বন্ধুবর সজনীকান্তের 'শনিবারের চিঠি'র পাবলিসিটি পর্যন্তই। একবার চেষ্টা করলাম ফিল্ম কার্টুনে। বাবুরাও প্যাটেল বলেছিলো, আসুন না বোম্বাইয়ে। দেখলাম, লাইনটা ভালো নয়। ভদ্রভাবে সমাজে থাকাটাও মানুষের একটা কর্তব্য বৈকি। তাই ছেড়ে দিলাম পথটা।

দেখলাম, সাহেবদের কাগজগুলোই কার্টুন বের করে। কিন্তু সেগুলো সবই ফিরিঙ্গি ও সাহেব মেমদের ছবি, বিদেশী ও সাহেব মেমদের ঘরোয়া বিষয়ে। আর ভারতীয়দের অবস্থা নিয়ে টিপ্পনী। পলিটিক্যাল কার্টুন বলে কিছু নেই। ঠিক তখন একদিন দেশপ্রিয় সেনগুপ্তের 'এডভান্স' কাগজে গিয়ে কার্টুনের বিষয় বলতেই আমার কাছে কার্টুন চাইলো তারা। বললো, কার্টুন তো খুঁজছি, লোক তো পাই না। তখন Diogenes নামে আমার প্রথম পলিটিক্যাল কার্টুন বের হল ৫ই নভেম্বর, ১৯৩৩ সালে।

কিছুদিন পরেই 'পত্রিকা' থেকে ফোন এল কার্টুনিষ্টের ঠিকানার জন্যে এডভান্স অফিসে। এবং তারপর থেকেই পত্রিকায় ১৯৩৪ সাল ও তারপর যুগান্তরে ১৯৩৭ সাল থেকে কার্টুন আরম্ভ হলো। কিন্তু পয়সা তেমন আসতো না। ইংরেজদের ষ্টেটস্‌ম্যানে শুধু লণ্ডনের Strube-এর কার্টুন বের হত।

পত্রিকা যুগান্তরে একটা নতুনের স্বাদ পেলাম। সেটা কার্টুনের রকমারি সৃষ্টির ব্যাপারে। তাই খুড়োর জন্ম হল ১৯৩৫ সালে। এবং যুদ্ধের সময়ে বিদেশীদের চোখে—'His one of the finest strips in the world.'

যুদ্ধের শেষ দিকেই কার্টুনের অর্থভাগ্য ফিরলো এবং

পয়সা আসতে লাগলো। এর আগের যুগটাতে তো শুধু জেদের মাথায় বাঙলাদেশের কার্টুনের জন্য জমিতে কোদাল চালিয়েই গিয়েছি। তেমন পয়সা তখন পেলাম কই ?

অন্যে হলে এ লাইন কবে ছেড়ে দিতো। আমার ব্যাপারে এটা তখন ছিলো অনেকটা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

তবে একটা জিনিষ আমার এই ক্ষুদ্র জীবনীতে দেখেচি। সেটা হচ্চে সাধনা এবং সততার সঙ্গে চেষ্টা। আর তার সঙ্গে জ্ঞান ও ইনফরমেশনের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করা। এ জিনিষটা আমার ইতিহাস ও অর্থনীতি, সঙ্গীত ও বিভিন্ন কোণ থেকে চিত্রের দৃষ্টিজ্ঞান—যাকে ছবিতে বলে perspective, এগুলো আমাকে অদ্ভুত সাহায্য করেচে। বাদ বাকি বিষয় তো সবারই বাঁধা গৎ, যাকে বলে সারেগামাপাধানিসা।

এখানো তাই সময় পেলেই নতুনত্বের সন্ধান করি—তা সে বেহালাতেই হোক, না হয় ড্রইংবোর্ডেই হোক। এই জন্যেই জেদের মাথায় কলকাতা প্লানেটরিয়ামের দিকবলয় বা skyline-টা দেড় মাসের উপর খেটে খাড়া করেচি এবং কলকাতাকে ওখানে নিজহাতে তৈরি করেচি দেখতে পেয়ে প্লানেটরিয়ামের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় চোখ দিয়ে জল আসছিলো। বুকে হাত দিয়ে নিজেকে বললাম, 'কাফীখাঁ, চেয়ে দেখ, বানিয়েছিস তো একটা জিনিষ এই ভারতের বুকের উপর যা অন্যে পারেনি !'

★

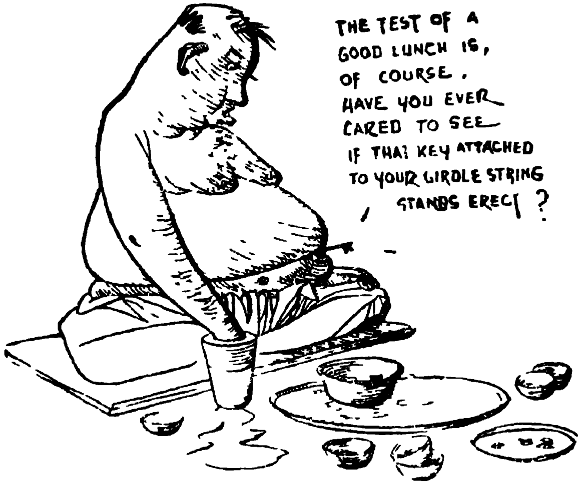
কাফীখাঁ ও Piciel-এর কার্টুনগুলি যথাক্রমে যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে ক্ষুদ্রাকারে পুনর্মুদ্রিত।

৬। পূর্ব পাকিস্তানে মাঘের নূতন ফসল



ভগীরথ ও গঙ্গা,





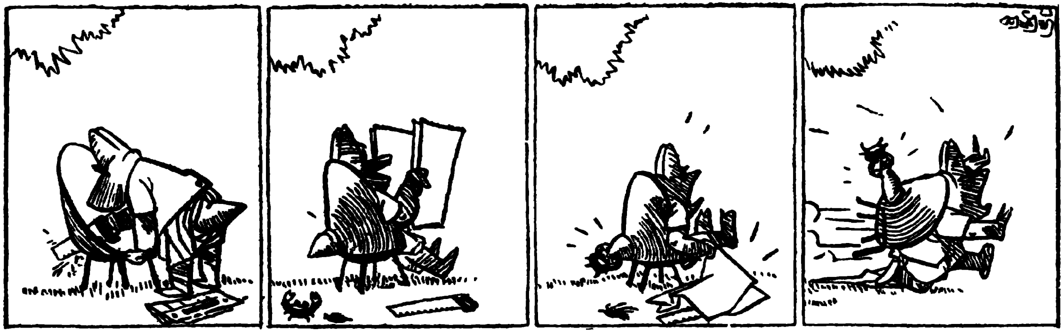
Piciel

সমস্যা—



এবারকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁহার ভাষণে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীর পক্ষে জোর ওকালতি করিয়াছেন।

শেয়াল পণ্ডিত-এর কুমীর।



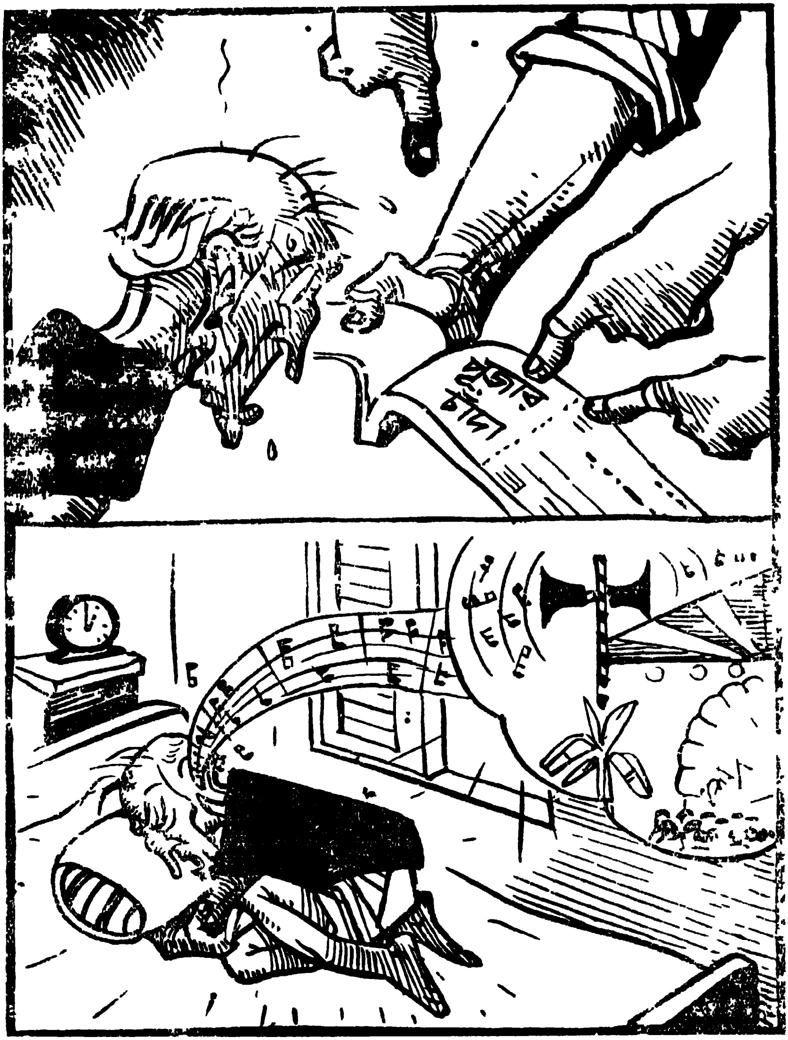
Khooro



What ? Eight annas for only hair dressing ?

Are you gone mad ?

What ? Four annas ?





দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

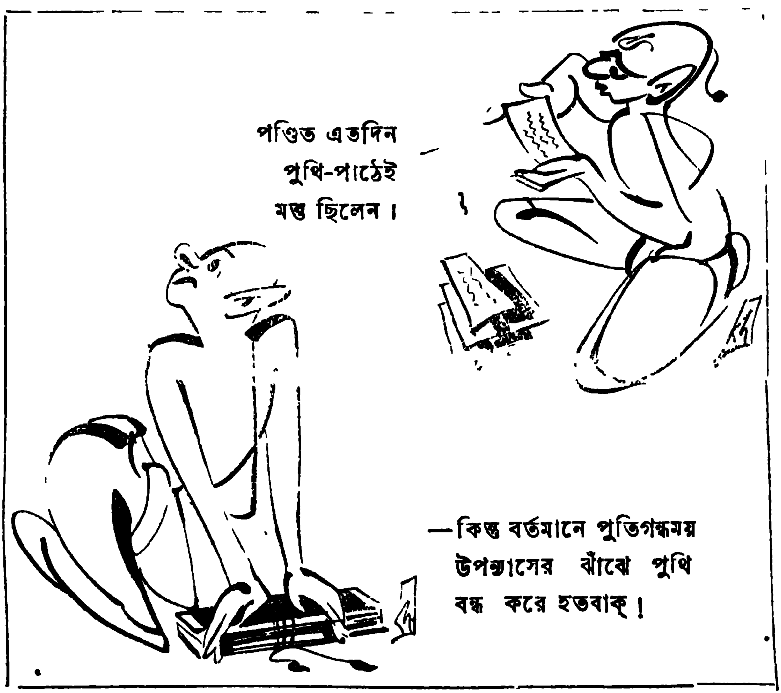
আমার আঁকা ছবিতে 'দে' লেখা দেখে যাঁরা জানেন না আমায়, তাঁদের ধারণা, ওটা আমার পদবী। আসলে ওটা আমার নামের প্রথম অক্ষর। ছোটবেলা থেকেই কেমন যেন ব্রাশ টানার দিকেই ঝোঁক এবং আজও অবিরাম ব্রাশ টেনে চলেছি। সাদা-কালো রংয়েই আমার পরিচিতি বেশী—তার আসল কারণ টাকা-আনা-পাইয়ের ব্যাপার। অর্থাৎ বন্ধুদের block খরচাটা কমাবার অনুরোধ। পথে-ঘাটের প্রদর্শনীর উপর আমার ততটা আকর্ষণ নেই বলেই আমার colour works ধামাচাপা দিয়েই রেখেছি। কার্টুন আঁকি খুবই কম, এবং তাও বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে।

আঁকবার সরঞ্জামের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে এদেশ-সেদেশ ঘুরে বেড়ানোই আমার নেশা। ঘাড়ে বন্দুক নিয়ে কিছুদিন যুদ্ধেও যোগ দিয়েছি। বন্ধুদের পেড়াপিড়িতে অনেকগুলি ছায়া-ছবির আর্ট ডিরেকসন দিতে হয়েছে ও পাবলিসিটির ছবিও হয়েছে আঁকতে আর নিতে হয়েছে বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ-সজ্জার ভার। শিল্পের উপর আমার লেখা বই : 'বাঘ ও অজন্তা' এবং 'ধারা থেকে মাণ্ডু'। সদ্য প্রকাশিত ছোটদের সচিত্র বই : 'রূপকথা'। আর্টের নানারকম বই সংগ্রহ

আর পড়া আমার আর এক নেশা। আর্টের চর্চা যাঁরা করেন, সংসার করার আর্ট তাঁদের জন্যে নয় বলেই আমার ধারণা—অথচ নিজে অ-পত্নীক হওয়া সত্ত্বেও সংসার-বন্ধনে রীতিমতই বন্দী। আর এক সংসার আমার শিষ্যদের নিয়ে। শিষ্য-ভাগ্য আমার ভালোই এবং তাঁদের 'গুরুমারা বিদ্যা' দেখলে খুবই আনন্দিত ও পুলকিত হই। বর্তমানে শিল্প ও স্থাপত্যের পাক্ষিক পত্রিকা 'দর্শক'-এর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত।

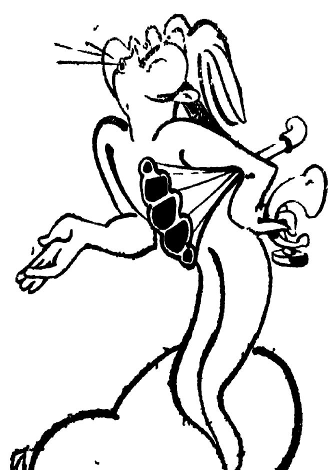
বাংলাদেশ বরাবরই রঙ্গ-ব্যঙ্গের দেশ। অথচ আমাদের দেশের আধুনিক কার্টুনগুলো প্রায়ই দেখি বিদেশী-ঘেঁসা। বর্তমান কার্টুনিষ্টরা এ বিষয়ে নিজেদের মাথা একটু ঘামাবেন, এই আশাই করি। নইলে মাইকেলের মত এঁদেরও একদিন অনুতাপ করতে হবে, 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন......'

বি: দ্র:—শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের দাড়ির আবির্ভাব ও অন্তর্ধান ঘটে থাকে তাঁর খেয়াল মাফিক। এখানে তাঁর ছবিটি দাড়িবন্ত এবং তাঁরই অজ্ঞাতে শিল্পী রেবতী ভূষণের আঁকা।

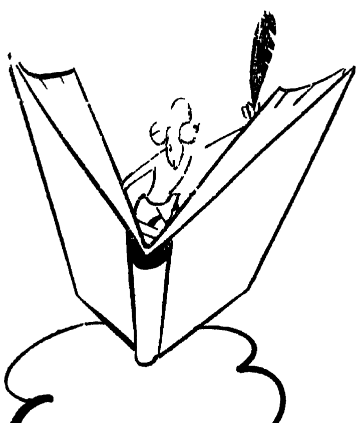




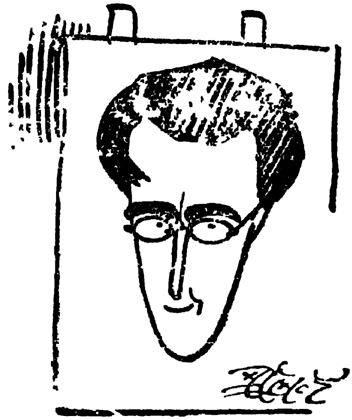
হাটে হাঁড়ি-ভাঙ্গা অন্নপূর্ণা



হাওয়াই-দেবতা
পবনদেব



চিত্রগুপ্তের খতিয়ান
(এঁকে দেখেই শিল্পীবর
মর্ত্যে পালিয়ে এসেছেন)



শৈল চক্রবর্তী

জন্ম হাওড়া জেলার আন্দুল মৌড়ী গ্রামে। পিতা ছিলেন একজন শিক্ষক। ছবি আঁকার হাত এবং আগ্রহ ছোট বেলা থেকেই। আর্টে হাতে-খড়ি স্বাভাবিকভাবে এবং শৈশবেই হয়েছিল—তারপর নিজের সাধনায় প্রতিষ্ঠিত।

নানারকম ষ্টাইলে ছবি আঁকতে ভালবাসি। কার্টুন দিয়েই শিল্পী জীবনের শুরু। প্রথমে শনিবারের চিঠি ও বসুমতীতে বের হতো ঐ সব ছবি। গল্পের ইলাস্ট্রেশনও সেই সময় থেকে আরম্ভ করি। ছোটদের নানা বইয়ে, বড়দের রসাল ও ব্যঙ্গ রচনার সঙ্গে বিচিত্র ও অপর্যাপ্ত ছবি এঁকেছি। বর্তমানে ব্যঙ্গ-চিত্র খুব বেশি আঁকি না। 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় ছোটদের রবিবাসরীয় পাতায় 'Little Dakoo' নামে যে রঙিন চিত্র-কাহিনী নিয়মিতভাবে বের হয় সেগুলি আমারই তুলি-কলম-প্রসূত। শুধু শিল্পে নয়, সাহিত্যেও কলম চালাই। স্বরচিত অনেকগুলি বই আছে। কয়েকটি কার্টুন সম্বলিত রম্য-রচনার বইও প্রকাশিত। তাছাড়া ছোটদের জন্যে আছে অজস্র লেখা ও ছোটদের বই। বই-এর জন্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও ভাগ্যে জুটেছে।



—তোমার এতগুলো নাম আমার মনে থাকবে না,
তাই নামাবলী ছাপিয়ে এনেছি ডার্লিং...



—বলছেন তো 'অগ্নিপরীক্ষা' শাড়ি,
কই দেশলাই জ্বেলে দেখান দেখি।



এলার্ম



—আমার জন্য প্লাটিকের এই নকল ফুল আনলে কেন ?

—আসল ফুল যে বেশীক্ষণ তাজা থাকে না রমা ! তোমার জন্য নীচে অপেক্ষা করতে করতেই শুকিয়ে যায় ।



প্রমথ সমাদ্দার

বন্ধু কুমারেশবাবু আমাকে বিপদেই ফেলে দিলেন। আমার আবার শিল্পজীবন, তা'র আবার জীবনী চাইচেন—নিজের লেখা। ঢাকায় স্কুলে যখন পড়ি, ক্লাসে পণ্ডিতমশাই নরঃ নরৌ নরাঃ পড়াচ্চেন, আ'র আমি তার প্রতিমূর্তি আঁকচি। পণ্ডিতমশাই টের পেয়ে চড়-চাপড় কানমলা তো দিলেনই, উপরন্তু ক্লাস থেকে গেট-আউট করে দিলেন। এই রকম প্রায়ই হত। স্কুল পালিয়ে রং-এর বাক্স নিয়ে মাঠের দিকে গিয়ে গাছের কিংবা কুঁড়ে ঘরের ছবি আঁকতাম। এইভাবে শিল্পটাকে ক্রমেই বেশী ভালবাসতে আরম্ভ করলাম।

১৯২১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় সিটি কলেজে আই-এ পড়তে শুরু করলাম মামাবাড়ি থেকে। ছবি আঁকা চলচেই সঙ্গে। মামা সিটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। উনি বরাবর বিলাতের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক হাস্যকৌতুক-পত্রিকা Punch কিনতেন। সে পত্রিকা দেখে কার্টুন আঁকবার একটা প্রবল ইচ্ছা হল। যাক আই-এ পরীক্ষায়

প্রথমবার ডিগবাজী খেয়ে দ্বিতীয়বার পাশ করে ভাবলাম, কি করি। বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও গভঃ আর্ট স্কুলে ভর্তি হলাম একদিন। টিচারের একটা বিদ্রূপ শুনে দেড় বৎসর ডুব মেরে বসে রইলাম, আবার ভর্তি হলাম কমার্শিয়াল সেকসনে ১৯২৬ সালে।

১৯২৯ সালে সার্টিফিকেট নিয়ে the then প্রসিদ্ধ আর্ট প্রেস-এ যুক্ত হলাম। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন আর্ট প্রেসের জেনারেল ম্যানেজার। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৩৮ সালে একটি হাস্যকৌতুক সাপ্তাহিক পত্রিকা বার হল। এই পত্রিকায় আমার আশা—কার্টুন আঁকার সুযোগ জুটে গেল।

ক্রমে কার্টুনিষ্ট জীবন এসে গেল এবং বিভিন্ন পত্রিকায় কার্টুন ছাপা শুরু হল। কোন সম্পাদক 'এ চলবে না' বলে ফেরৎ দিতেন, কোন সম্পাদক 'রেখে যান, দেখব পরে' বলে বিদায় দিতেন। মূল্যের বিষয়ে 'আমরা ২৲ টাকার বেশী দিতে পারব না', আবার 'পয়সা টয়সা মশাই দিতে পারব না।' আবার অনেক সম্পাদক 'বাঃ চমৎকার হয়েছে।'—ছবি দেখে হয়ত হাসতেই লাগলেন। যখন কোন সম্পাদক বলতেন, 'চলবে না', তখন ভাবতাম ধ্যেস্, কার্টুন ছেড়েই দেব। আবার চমৎকার বললে উৎসাহ বেড়ে যেত। এই রকম তাঁতির মাকুর মতন সম্পাদকবাড়ি ঘুরে-ঘুরে জীবন কাটতে লাগল। হতাশ হলাম না, নিজের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে একটু সুনাম পেলাম (?) এবং ভারতবর্ষের বহু পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত খেটেও পেটে খিদের কোঁ কোঁ ডাক চলতেই থাকত এবং এখনও সেই ডাক চলচে। বহু লোককে হাসিয়েছি কিন্তু নিজে আর হাসতে পারলাম না। এই কথা বলে শেষ করি—কার্টুন নেশা করা চলতে পারে, পেশা করা চলতে পারে না।

★



—স্যার, ডিয়ারনেস এলাউন্স বাড়িয়ে দিতে হবে, ছেলেরা স্কুল-ফী-এর সঙ্গে ফিল্ম-ফী দাবী করছে বাড়ীতে…



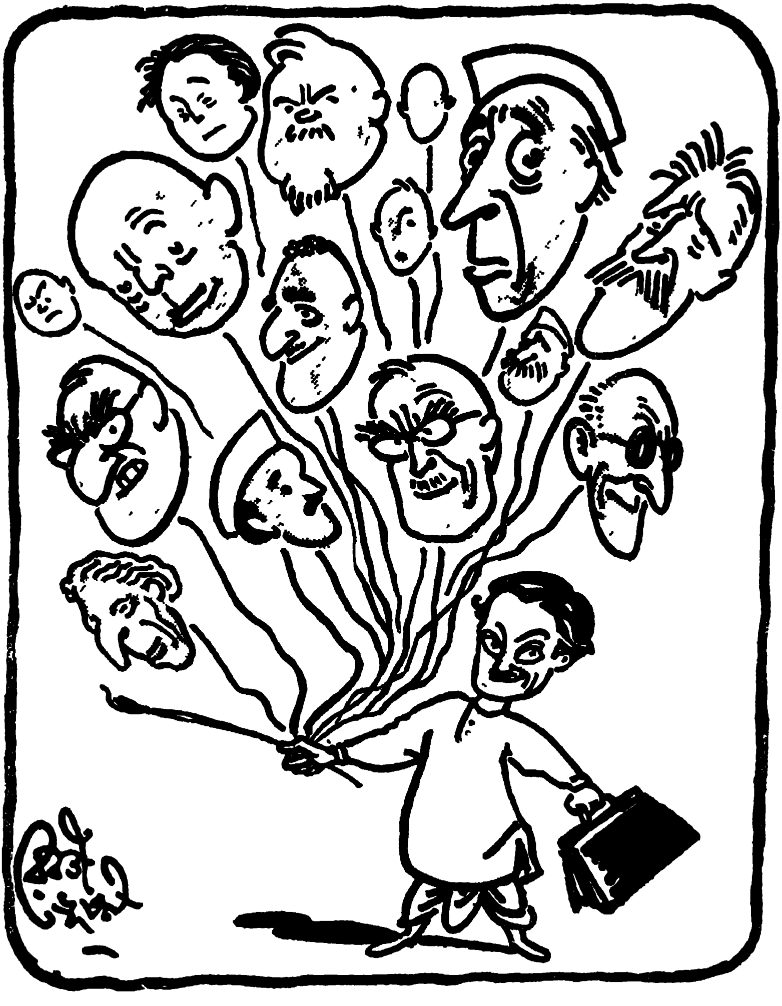
—স্যার, আপনার চার নম্বরের ভেরি-ভেরি আরজেণ্ট ফাইল-কেসে গোখরো সাপ ডিম পেড়েছে।



আগে-পরে



পশ্চিম বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল-পাঠ্য পুস্তক



রেবতীভূষণ

আমার 'বালি'-তে বাস। মানে, হাওড়া জেলার বালি সহরে। ছোট বেলা থেকেই আঁকার দিকে ঝোঁক। মামাবাড়ির চওড়া বারান্দায় ছবি এঁকে-এঁকে বহু চকখড়ি খইয়েছি। পরে 'সচিত্র শিশিরে' ৺বিনয়কৃষ্ণ বসুর কার্টুন দেখে কার্টুন আঁকবার উৎসাহ পাই। আর্ট স্কুলে গিয়ে এ আর্ট শিখিনি কোনদিন।

কলেজ ম্যাগাজিন, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় খেলাধুলা বিভাগে অনেক কার্টুন এঁকেছি। মাঝে-মাঝে দীপালী, মাতৃভুমিতে আমার তুলির আঁচড় পড়েছে। ৺সজনীকান্ত দাসের উৎসাহেই 'সচিত্র ভারত'-এ আমার কার্টুন ছাপা হয়। বিদেশী কার্টুনিষ্ট Low, Windham Robinson, জাপানী কার্টুনিষ্ট Sapaju প্রভৃতির কার্টুন থেকেও পেয়েছি প্রেরণা। বর্তমানে যুগান্তরের বার্তা-সম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর নির্দেশে নিয়মিত 'ব্যঙ্গ বৈঠক' এঁকে থাকি। Animal Drawing-এ আমার তুলির ঝোঁকটা বেশী যেন। সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কাটতেও আমার কলম তুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলে। ছড়া-ছবির বইও একখানা আছে: 'সবুজ টিয়া'। এই সঙ্গে গোপনে জানিয়ে রাখি—একটু-আধটু গলা-চর্চাও করে থাকি এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতে নাকি আমার কিছুটা দখলও আছে—এমন কথাও কানে আসে প্রায়ই। আবার এও শুনি, আমি নাকি সর্ববিষয়ে একটি 'Late Latif'।

★



বাড়ি নেই ! বাড়ি নেই !! বাড়ি নেই !!!



নন্দী—মা, তোমার ঐ ত্রিশূল রেখে এই ছিপগাছা ধরো দেখি।
মাছের আকালে তোমার ছেলেমেয়েরা খুশি হবে।



'রবিবর্মার অনুকরণে'

রঘুনাথ গোস্বামী

সুনামধন্য শিল্পী অন্নদা মুন্সীর কাছে এঁর শিল্প-শিক্ষা শুরু। পরে নিজের চেষ্টায় আজ ইনি কমার্শিয়াল আর্টে সুখ্যাত এবং বর্তমানে একটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যষ্টি-মধু জন্ম থেকেই এঁর ব্যঙ্গ চিত্রকর্মের বহু নমুনা বহন করে আসছে। প্রথম দু' বৎসরের প্রচ্ছদপট এঁরই অঙ্কিত এবং আজও এঁর আঁকা যষ্টি-মধুর Title Page, অথ - যম - কথা, নাটিকা ইত্যাদি Head piece এবং বহু Tail piece গুলি দিয়ে যষ্টি-মধু সুশোভিত। 'কুশ' রচিত 'স্বামী পালন পদ্ধতিতে' এঁর বিচিত্র চিত্রগুলি আজও পাঠকবর্গের আনন্দ যোগায়। তুলির মত বাদ্যযন্ত্রেও শ্রীগোস্বামীর যথেষ্ট অনুরাগ। বর্তমান বছরে ইনি 'হট্টগোল বিজয়' নামে পাপেট-ফিল্মের জন্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত।



শিল্পীর মতে—বিশ্বশান্তি চুলোয় যাক—গৃহ-শান্তির একমাত্র উপায় : বিয়ের আগে 'স্বামীপালন পদ্ধতি'র lesson দেওয়া এবং নেওয়া।

আর বিবাহ মানে—



বি-পুর্বক বহ্‌ ধাতু ঘঙ—সং ?

সোজা কথায়—



ফাঁস-ই !!!!

(মানে য পলায়তি স জীবতি)

আর যদি বিয়েটাকে দিল্লীকা-লাড্ডু বলেই মনে হয়, তবে বহুবিধ নিয়ম পালন করাই নিয়ম এবং কয়েকটি নিয়ম বিশেষভাবে পালনীয়। যথা—



যখন-তখন চা-খাওয়া চাষামী।



জানালায় দাঁড়ানো অসভ্যতা।



ক্লাবে যেতে হলেও বলা
উচিত, একটু যেতে
পাার 'স্যার'?—



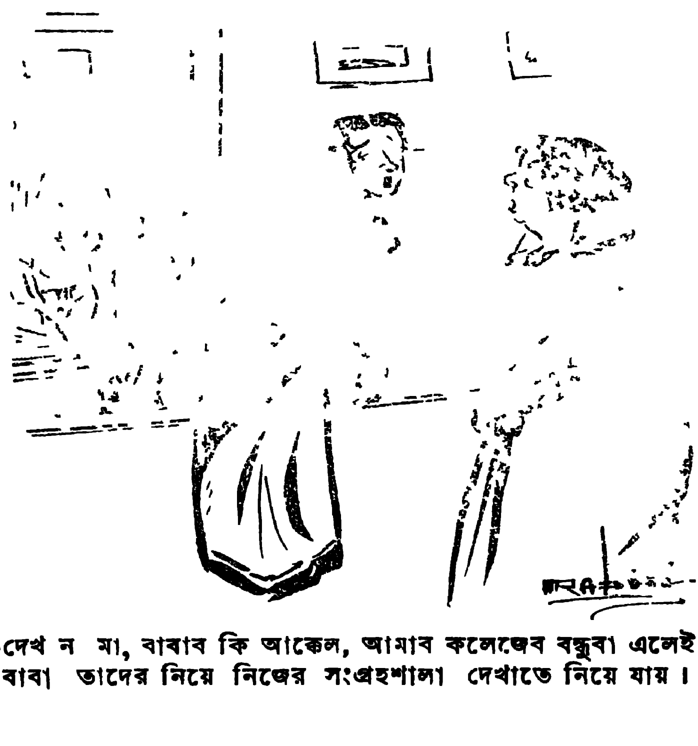
এবং সব সময়েই দরকার গৃহিণীর 'পোঁ-ধরা'।
(অবশ্য এটা হাল-জীবনের বড় কৃতিত্ব!)

'কুশ' রচিত
'স্বামী পালন পদ্ধতি'
থেকে



রবীন ভট্টাচার্য

কেন কার্টুন আঁকতে আরম্ভ করলাম? নিছক খেয়ালের বশেই কার্টুন আঁকতে শুরু করেছিলাম একটু মজা করবার জন্য। সেটা বোধ হয় বছর কুড়ি আগের কথা। হাস্য-কৌতুকের পত্রিকা 'সচিত্র ভারত'-এ প্রথম আমার হাতে খড়ি। প্রথম কার্টুন প্রকাশিত হবার পর, মনটা ঝুঁকে পড়লো এই দিকে। তারপর অচলপত্র, সচিত্র সাপ্তাহিক প্রভৃতি কাগজের নিকট উৎসাহ পেয়ে হয়ে পড়লাম পুরোপুরি কার্টুনিষ্ট। কোন চিত্রবিদ্যালয়ে আমি আঁকা শিখিনি, সুতরাং আমার পদ্ধতির দোষ দেখা যেতে পারে কিন্তু আমি আমার কার্টুনের দ্বারা সামান্য কয়েকজনের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করি। বিখ্যাত কার্টুনিষ্ট 'পিসিয়েল' ওরফে 'কাফীখাঁর' কার্টুন আমার কাছে খুব ভাল লাগে। কিন্তু আমার কার্টুন আঁকার মধ্যে শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর প্রমথ সমাদ্দারের প্রভাবই বেশি। উৎসাহ দাতার মধ্যে অচলপত্র সম্পাদক দীপ্তেন্দ্রকুমার সকলের প্রধান।



—দেখ না মা, বাবার কি আক্কেল, আমার কলেজের বন্ধুরা এলেই বাবা তাদের নিয়ে নিজের সংগ্রহশালা দেখাতে নিয়ে যায়।





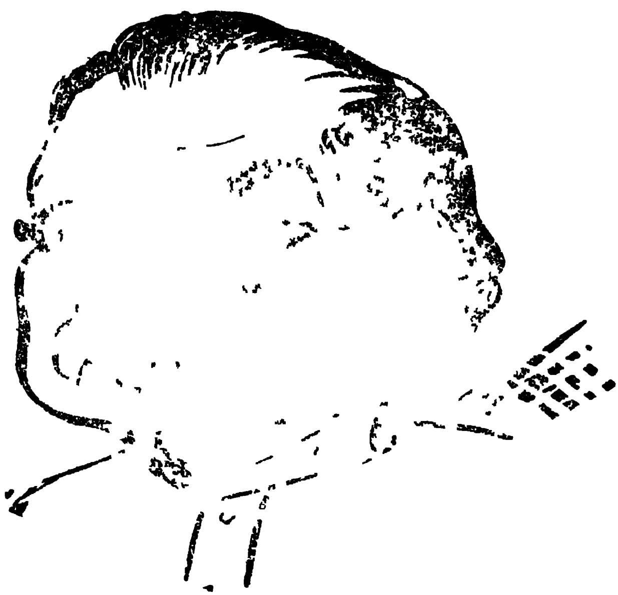
—কি সওয়ালই না করলেন উকিলবাবু!—পকেটমার হয়েও নিজেকে মন্ত্রীদের মত সৎলোক মনে হচ্ছে!

অখিল নিয়োগী

একেবারেই পাঠশালা থেকেই সুরু।

গুরুমশায়ের মাথা, সহপাঠীর হাসি-কান্নায় মুখ—কিম্বা কুকুর বেড়ালের কৌতুক—এই সব দিয়েই কার্টুন আঁকার হাতে খড়ি।

তারপর গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে। 'আর্টিষ্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের' সেক্রেটারী। সেখান থেকে 'চিত্রা' প্রকাশ এবং তুলি আর লেখনী এক ভাবেই চালনা। 'শিশুসাথী'তে ধারাবাহিক ভাবে কিশোর-উপন্যাস 'বেপরোয়া' প্রকাশ। সঙ্গে নিজের হাতে আঁকা হাসির ছবি। এক কালে 'দীপালী', 'খেয়ালী', 'যুগান্তর', 'শিশির', 'ভগ্নদূত'-এ অনেক হাসির ছবি এঁকেছি।



তখনকার দিনে পুজোসংখ্যায় হাসির গল্পের চাহিদা ছিল। সেজন্যে বিভিন্ন কাগজে 'শ্রীঅখিল নিয়োগী লিখিত ও চিত্রিত' এই শিরোনামায় বহু লেখা লিখতে হয়েছে। তারই ফলে প্রকাশিত হয়েছে 'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গ ভরা', 'বহুরূপী', 'গভীর গাড্ডা' ও 'মুখোসের মেলা'।

একদা সজনীকান্ত দাস 'কেডস্ ও স্যাণ্ডাল' নামে বিখ্যাত একটি কৌতুক কবিতা রচনা করেন। তার কার্টুন আঁকতে হয়েছিল পুজো সংখ্যা আনন্দবাজারে।

এখনো অবসর পেলেই 'ভারতবর্ষ', 'নবকল্লোল' প্রভৃতিতে কৌতুক কাহিনী লিখে থাকি। তার অধিকাংশ ছবি নিজেরই আঁকা। শিল্পী-বন্ধুরা এখনো কার্টুন আঁকতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু সব পেয়েছির আসরের কাজ করে সময় খুব কমই পাই।

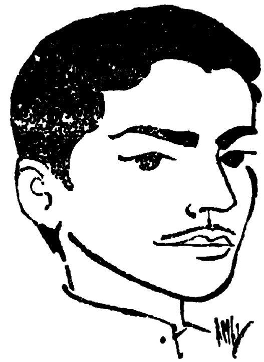
দেশী-বিদেশী সব কার্টুনিষ্টের কার্টুন দেখতে চির কালই ভালো লাগে।



—হুঁঃ! আমার বরাতে ঘোমটা এখনো ঘুচলো না। দেখতো ওরা কেমন—

কা—৩

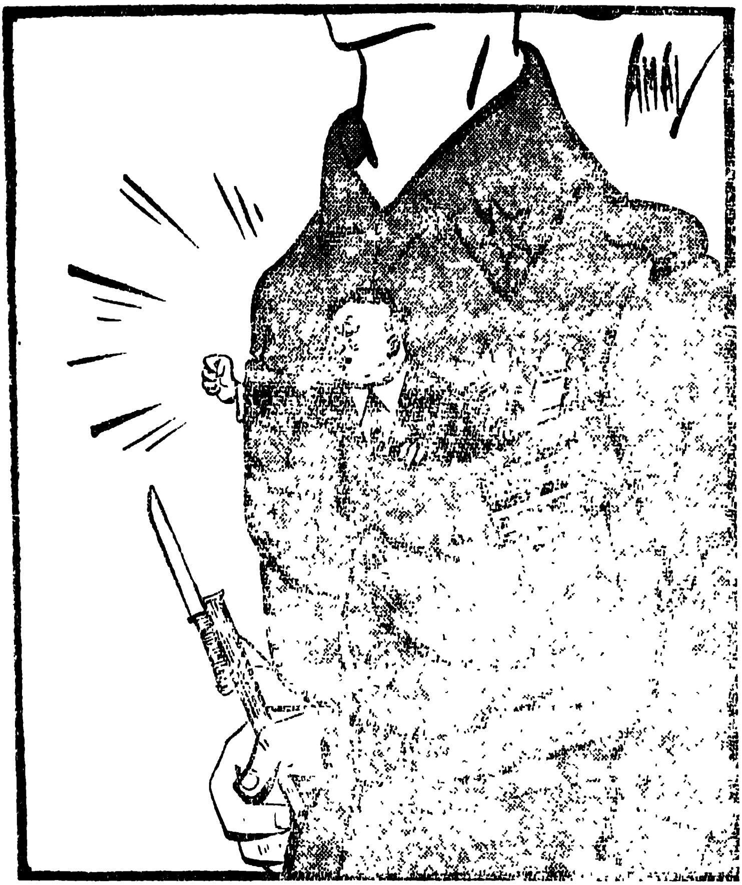
অমল চক্রবর্তী



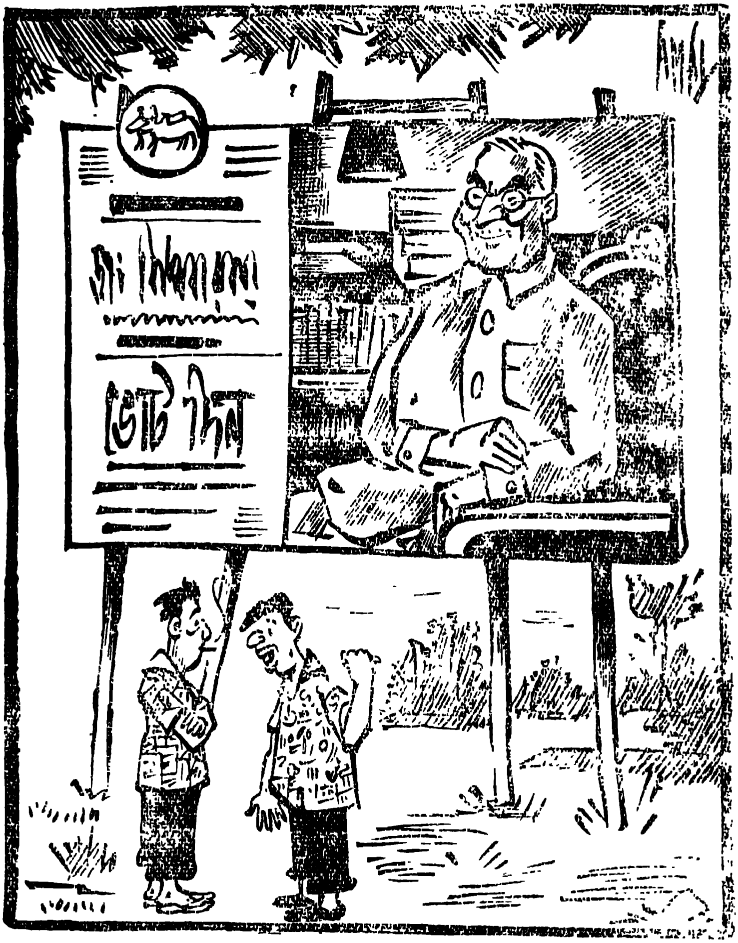
কেন কার্টুন আঁকি ঠিক করে বলতে পারব না। নিছক আনন্দ না অন্য কিছু এর পেছনে আছে যখন বিচার করতে যাই তখন সমস্তটাই জট পাকিয়ে যায়। যাই হোক, প্রায় বছর বারো তেরো আগে পিতা ডাঃ সুধীরকুমার চক্রবর্তীর প্রেরণায় কার্টুন আঁকার সূত্রপাত হয়। এখন আমার বয়স ২৭। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল। কি জানি কেন, কার্টুন ছবি বেশি আকর্ষণ করত। বাড়িতেই কার্টুন চর্চা শুরু করি। প্রথম প্রথম কার্টুন বেরোয় 'পরাগ' সাপ্তাহিকে। তারপর 'সচিত্র ভারত' ও 'শঙ্করস্ উইকলি'তে।

১৯৫০-৫১ সালে যোগাযোগ হয় শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্তীর সঙ্গে। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ না ঘটলে আমার কার্টুন আঁকা অনেকদিন আগেই থেমে যেত। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী। যে চোখ থাকলে কার্টুনিষ্ট হওয়া যায় সে চোখ তিনিই আমার খুলে দিয়েছেন। কার্টুন আঁকা চলার সাথে সাথে পড়াশোনাও করতে থাকি এবং সিটি কলেজ থেকে ১৯৫৪ সালে B. A. পাশ করার পর Railway Urban Bank-এ চাকরিতে ঢুকি। কেরানির চাকরি। দীর্ঘ ছ' বছর এই চাকরি করি। সম্প্রতি চাকরি ছেড়ে পুরোপুরিভাবে কার্টুন নিয়েই আছি। কার্টুন আঁকা ছাড়া Statesman কাগজে নিয়মিতভাবে Illustration-এর কাজও করি। অবসর সময়ে গীটার বাজানোর বিশেষ ঝোঁক আছে। মোটামুটি বাজাতেও পারি। আমার একমাত্র লক্ষ্য কার্টুন আঁকা ছেড়ে দেওয়া!


AMAY



খুঁটির জোরে



—ছবিটা কোথায় হচ্ছে মাইরি?

চণ্ডী লাহিড়ী



ইংরেজীর ক্লাস শেষ হল, এবার ইকনমিক্স। ডি-এম-এর ক্লাস। আসল নাম ধীরেন মুখার্জী। আড়ালে বলতাম ডি-এম। উভয় অর্থে। আদ্যক্ষর সংযোগ এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের উপযোগী গাম্ভীর্যের জন্যও। আগের দিন, টাকার ব্যবহার ও তার মূল্য নির্দ্ধারণ নিয়ে লম্বা লেকচার দিয়ে গিয়েছেন। আজ বোধহয় তার ফলশ্রুতি।

বাইরে চটির শব্দে হাত থেমে গেল। ডি-এম প্রবেশ করলেন ক্লাসে। স্বভাব মত, সোজা চলে গেলেন ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। ডাষ্টার দিয়ে বোর্ড পরিষ্কার করতে যাবেন, কিন্তু হাতটা একবার উঠেই থেমে গেল। পিছন ফিরে সারা ক্লাসের ছাত্রদের একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন তারপর গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন, 'কে এই ছবির শিল্পী জানি না, কিন্তু আমি তার প্রশংসা করি। চমৎকার হয়েছে। Utility of money-র ব্যাখ্যা এর চেয়ে ভাল আমিও করতে পারতাম না। যিনিই এর শিল্পী হোন না কেন তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি ছবিটা মুছে ফেলছি। কর্তব্যের প্রয়োজনেই অবশ্য।'

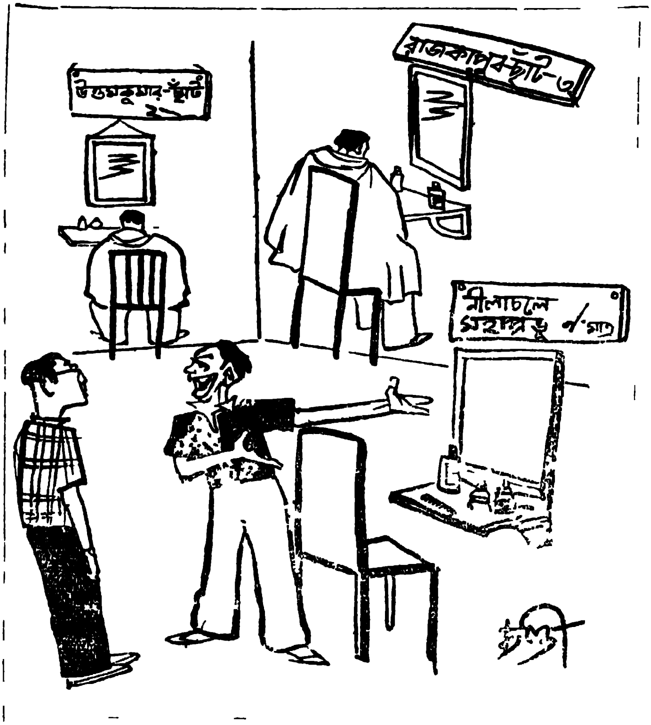
পরক্ষণেই ছবিটা মুছে তিনি নোট দিতে সুরু করলেন। সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রের পক্ষে এমন ছবি আঁকা অবশ্যই গর্হিত কর্ম। Eat drink and be merry এই প্রাজ্ঞজন কথিত বহুল স্বীকৃত তত্ত্বটি ছবি দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে বোঝাবার চেষ্টা অপরিণত বুদ্ধি কিশোরের পক্ষে এমন কিছু প্রশংসনীয় উদ্যম নয়।

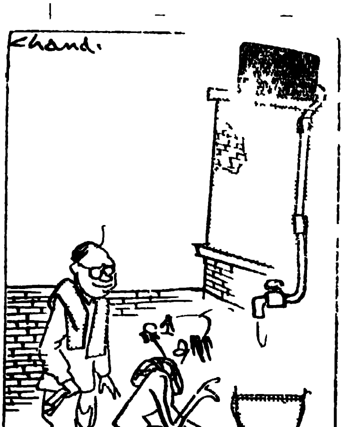
ছুটির ঘণ্টাও একসময় বাজলো। ডাক পড়ল প্রফেসর রুমে। ডি-এম বললেন,—'দেখ চণ্ডীচরণ, ছবি আঁকা জিনিসটা খুব ভালো। তুমি যতই ভিজে বেড়াল সেজে বসে থাকো না কেন, ওটা যে তুমিই এঁকেছিলে সেটা আমি বিলক্ষণ জানি।

I admire your attempt, but not courage. টেস্ট সামনেই কোর্স এখনও শেষ হয়নি, এসময়টা নিশ্চয়ই ছবি আঁকার উপযুক্ত সময় নয়। পরীক্ষা শেষ করে ডিগ্রীগুলো নিয়ে তারপর জীবন ভোর ছবি এঁকো, আপত্তি করবো না।' তাঁর কণ্ঠস্বরে রাগ ছিল না। কিন্তু আজ দেখি ভাগ্যচক্রে তাঁর সেদিনের সাবধান-বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কুড়ানো শেষ করেছি কিন্তু সে সব কোন কাজে লাগল না। লক্ষণ দেখে বুঝছি, জীবনভোর ছবিই এঁকে যেতে হবে।

সাংবাদিকতার হাতেখড়িও আমার এই নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হিসাবে। পরে কলকাতায় এসে দশবছর অবিচ্ছিন্ন সাংবাদিকতা করেছি এক কনিষ্ঠ সংবাদপত্রে। অবশ্য সব সময়েই কোন না কোন সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। এখনো সংবাদপত্রের সঙ্গেই জড়িত।





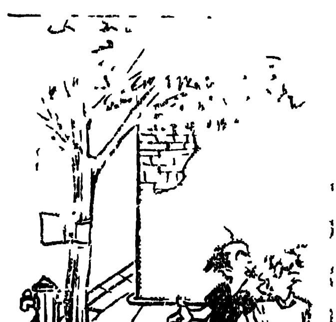


—কলকাতায় সুখ, এই
ঘরে বসে গঙ্গাস্নান—

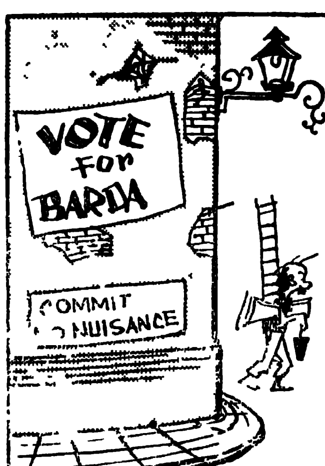


—ভোটের কাগজ তুলে
চুনকাম করতে 'রোজ'
বেশি লাগবে বাবু—



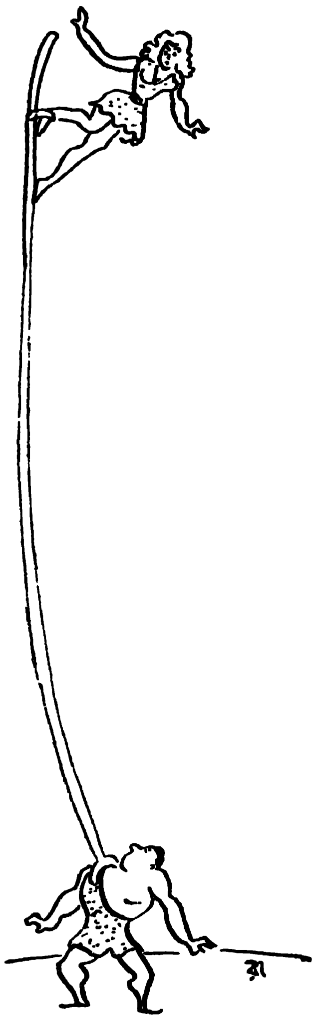


—প্রচুর আলো হাওয়া, কাছেই বাস-ষ্টপ, জলের কল,—শুধু চারটে দেওয়াল আর ছাদ বানিয়ে নেবেন।





ভাড়া-বৃদ্ধি



'ষষ্টি-মধু'র
তিক্ত-মধুর
খেল হয়েছে শুরু।
আনন্দে কেউ
হাসবে, কারোর
বক্ষ দুরু-দুরু।।

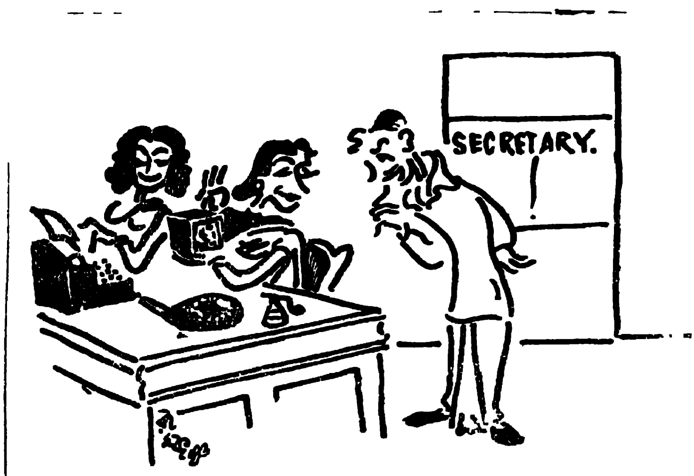


রামকৃষ্ণ রায়

জমিদার বংশে আমার জন্ম। শিক্ষা—নন্‌ম্যাট্রিক। পড়াশোনা শুরু হয় প্রথমে কলকাতায়, পরে বিহারের দ্বারভাঙ্গায়। প্রথম প্রকাশিত কার্টুন—তদানীন্তন প্রবোধ সমাদ্দার সম্পাদিত 'সচিত্র ভারতে', ষোল বছর বয়সে। ঐ সময়ে প্রথম লেখা গল্প প্রকাশিত হয় আসামের একটি বাংলা কাগজে। কিছুদিন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে সাহিত্য প্রেরণা প্রবল হয়। কর্মজীবন—পিতার অবস্থা খারাপ হওয়ায় দ্বারভাঙ্গায়

থাকা কালীন আঠারো বছর বয়স থেকেই রুজী-রোজগারের চেষ্টা : স্কুল-মাষ্টারি চার বছর, সিনেমা হাউসের প্রচার বিভাগে চাকুরি একই সময়ে। পরে কলকাতায় এসে ওষুধের ফার্মে চাকুরি বাইশ দিন, জুতোর দোকানে চাকুরি ছ'দিন। কিছুদিন চাকুরি জীবনের ইতি দিয়ে পেশা গ্রহণ—কার্টুনিষ্ট ও আর্টিষ্টের। সর্বশেষে উল্টোরথ পত্রিকার জন্ম থেকে সম্পাদকীয় বিভাগে চাকুরি। এখনও এইখানেই। কার্টুনিষ্ট হওয়া ছাড়াও লেখক। বিহারের বাংলা গল্প প্রতিযোগিতায় বেনামে গল্প লিখে প্রথম পুরস্কার লাভ। সখের নেশা—অনুসন্ধিৎসা ও সাধারণ জিনিস থেকে শিল্পকর্ম করা। এ ছাড়া বিভিন্ন ভাষার বই পড়া এবং ঘুরে বেড়ান। পারিবারিক জীবন—বিবাহিত; তিন কন্যার জনক। কুমারেশ ঘোষের কবিতার বই 'কটাক্ষ' আমার কার্টুনেই কণ্টকিত আর যষ্টি-মধু-র শৈশবের বহু কার্টুন শ্রীরামকৃষ্ণ নামে আমার তুলি-কলম-প্রসূত।

N. B.—আগের পাতার পাশের ব্যঙ্গ-চিত্রটি যষ্টি-মধুর প্রথম কার্টুন হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণেরই ঐতিহাসিক সৃষ্টি। কবিতা দুটি 'কটাক্ষ' থেকে নেওয়া।



আগে নিজের কাজ বাগাতে
পয়সা গুঁজে দিতাম হাতে
কানে কানে বলে দিতাম, 'কাজ যেন হয় দাদা।'
চেয়ারে এখন দিদিরা সব
কারোর খোঁপা, কারোর বা বব্,
(এদের) সাবান ক্রীম ঘুস্ দেবো ? না, শুরু করবো সাধা ?



'বার'-বণিতা



যখন, লেডিজ সীটে বসে দেখি,
আছে, বাস-ষ্টপে মেয়ে।
ভয়ে, বুকটা ওঠে ধড়াস ক'রে
থাকি অন্যদিকে চেয়ে ।।

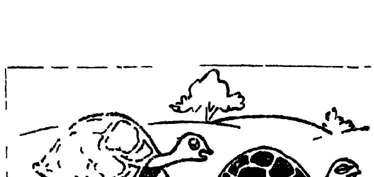


প্রশান্ত চৌধুরী

আমি বর্তমানে চল্লিশ। পিতা: অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী। অনুজ: জয়ন্ত চৌধুরী (কলিকাতা বেতারকেন্দ্র)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। সন্তরণে আন্তঃস্কুল ও আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় একাধিক পুরস্কার জয়ী। প্রথম কার্টুনের প্রকাশ—সচিত্রভারত (১৯৪২)। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অগুনতি কার্টুন প্রকাশিত। গত পাঁচ বছর কার্টুন আঁকা স্থগিত। উপন্যাসিক ও নাট্যকার। মিনার্ভা থিয়েটারে নিজেরই লেখা 'প্রত্যাবর্তন' নাটকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় (১৯৫৭)। প্রকাশিত উপন্যাস ১০ খানি, নাটক ২, ছোটদের বই ৩। 'ছুট' উপন্যাসের চিত্ররূপ 'জন্মতিথি' ১৯৫৯ সালে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার প্রাপ্ত।



ফুটবল খেলোয়াড়ের স্বপ্ন!



'আহা, শোনোই না?—শুনছো...



কুমার অজিত

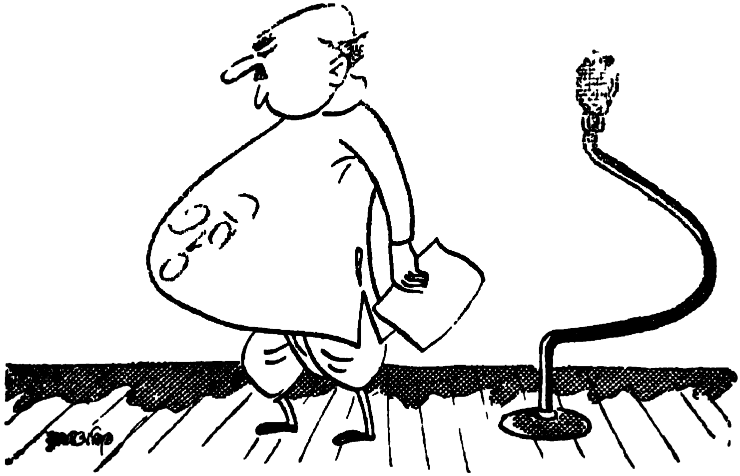
কার্টুন সংখ্যার ঘোষণা দেখে আশ্বস্ত বোধ করছি। ভঙ্গ বঙ্গ দেশে তাহলে এখনও রসবোধ আছে!

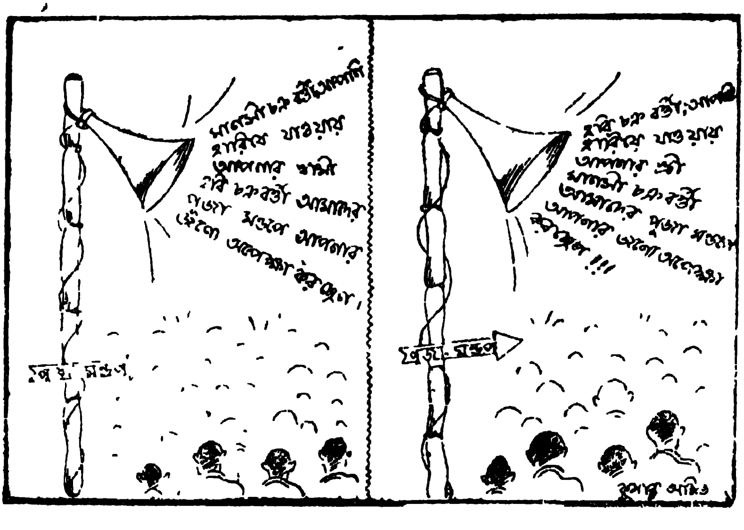
'আপনার চোখে আপনি' মানে 'আমার চোখে আমি' লেখা বড় মুস্কিলের ব্যাপার। আমার চোখে আমি তো, রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও প্রতিভাবান, সুভাষচন্দ্র অপেক্ষাও দেশপ্রেমিক, বিবেকানন্দ অপেক্ষাও কর্মযোগী, রামকৃষ্ণ অপেক্ষাও ধার্মিক এবং উত্তমকুমার অপেক্ষাও রমনীমোহন।

যাক, যেটুকু নিজের বিষয়ে জানি, তাই জানাই : ১৯৫৪-র ফাইন আর্টের চর্চা করতাম। সুপার-ফাইন আর্টের চর্চা করব কিনা ভাবছি। মাসিক আয় কাউকে বলতে নেই, স্ত্রীকেও নয়। অবশ্য আমি এখনও অকৃতদার।

আর্টের চর্চাটা নেশাও নয় পেশাও নয়। যেখানে কিছু প্রাপ্তিযোগ থাকে সেখানে বলি পেশা। যাঁরা উপুড়হস্ত করতে নারাজ তাঁরা বলেন, এটা আমার নেশা। আমার কিছু-কিছু আঁকা 'উল্টোরথ' আর 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকায় দেখবেন হয়তো। ভাল যদি লাগে প্রশংসা করবেন। খারাপ লাগলে ডাক্তারকে চোখ দেখাতে উপদেশ দেব। আমার নামটার বিষয়ে চুপি-চুপি জানাচ্ছি, পিতৃদত্ত নাম : অজিতকুমার দাশ। শুনেছি বাংলাদেশে নামের আগে অথবা পরে 'কুমার' থাকা নাকি পয়মন্তের লক্ষণ। তাই কুমার শব্দটিকে মধ্যস্থ না করে, করেছি শিরস্থ।

★




মালতী চক্রবর্তী আপনি
হারিয়ে যাওয়ায়
আপনার স্বামী
হরি চক্রবর্তী আমাদের
পূজা মণ্ডপে আপনার
জন্যে অপেক্ষা করছেন।
পূজা মণ্ডপ
হরি চক্রবর্তী; আপনি
হারিয়ে যাওয়ায়
আপনার স্ত্রী
মালতী চক্রবর্তী
আমাদের পূজা মণ্ডপে
আপনার জন্যে অপেক্ষা
করছেন !!!
পূজা - মণ্ডপ



ওমিও

—সত্যি বই মিথ্যা বলিব না—

জন্ম—বহু যুগ আগে তবে এও ঠিক যে, ভিক্টোরিয়ার আমলেও নয়।

শিক্ষা—পরীক্ষা দিয়ে থাকা ছাত্র (০) অতিরিক্ত পেপার 'ছায়া অবলম্বন'।

পেশা—নিজের হিসাব না রেখে অন্যের জাবেদা খাতা রাখা।

নেশা—তাজ্জব দুনিয়ায় কোন রংটা এসিড প্রুফ সেটা জানা।

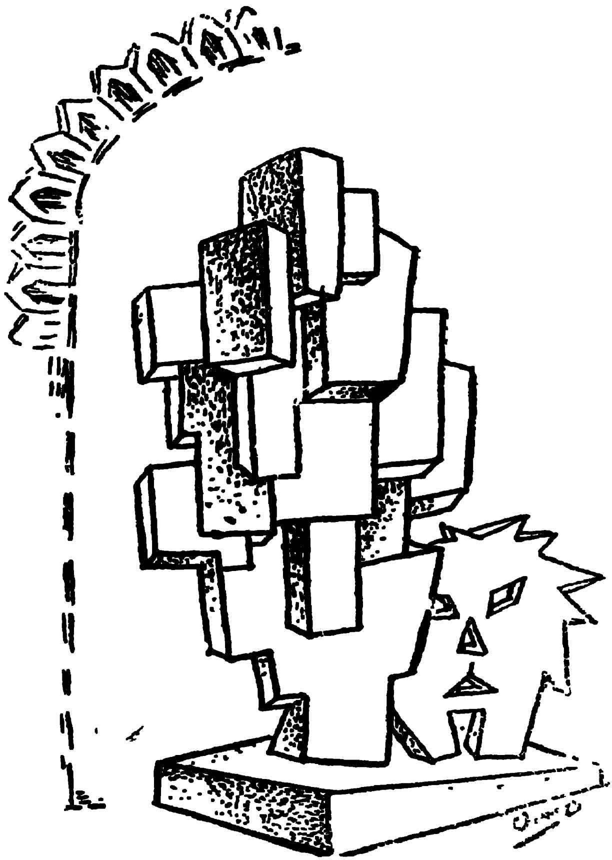
ভাবনা—মেয়েলোক হাসে কেন?

ইচ্ছা—তেলের দাম কমুক।

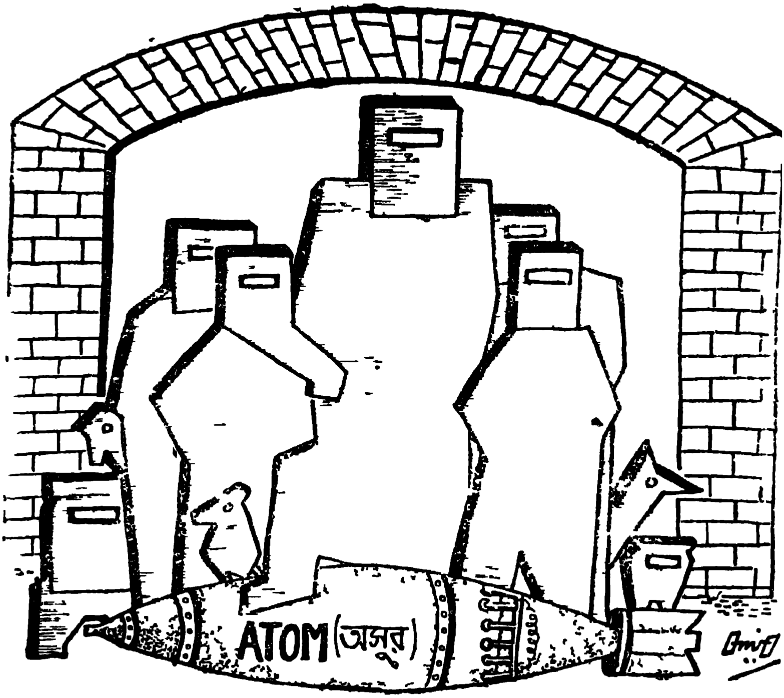
---

(০) কন্যা পক্ষ জিগ্যেস করেছিলেন, ছেলে কি করে? উত্তরে বরপক্ষ বললেন, পরীক্ষা দেওয়াই তার পেশা। এবার বসবে সে আবার এক পরীক্ষায়—

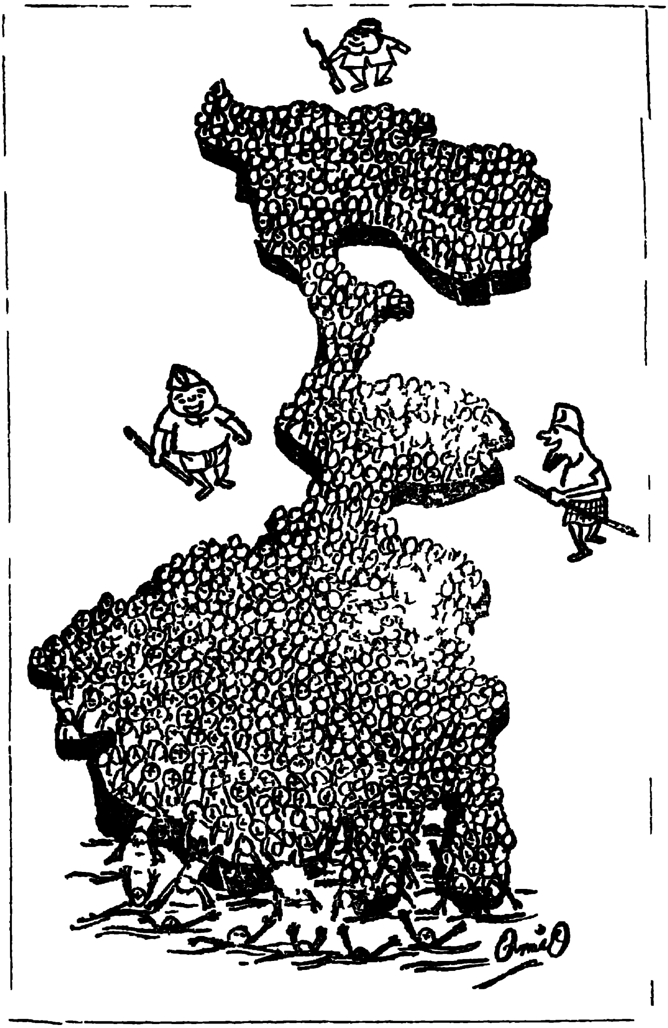




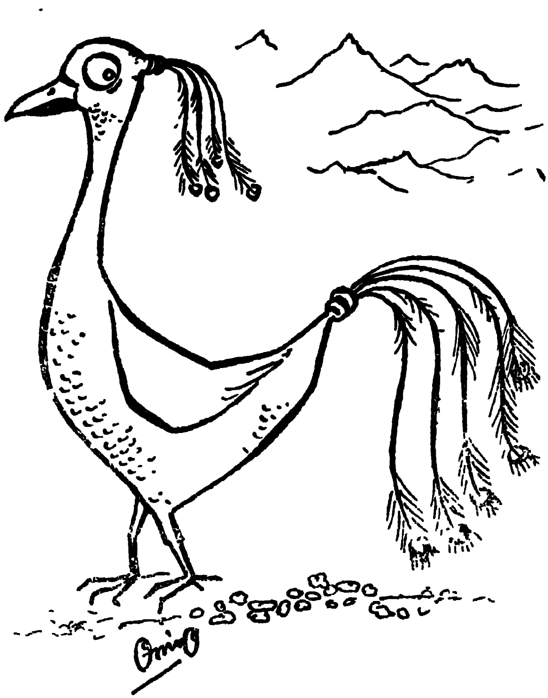
পাষাণী।



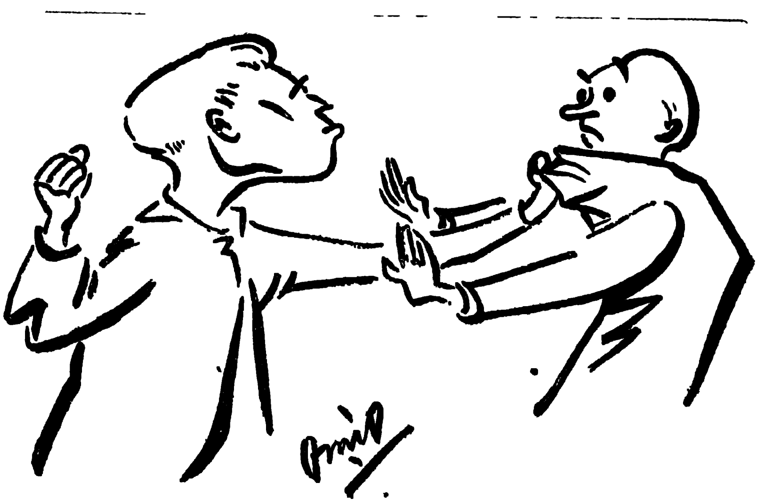
এ্যাটম যুগে 'মা'



‘আজি দখিণ দুয়ার খোলা—’



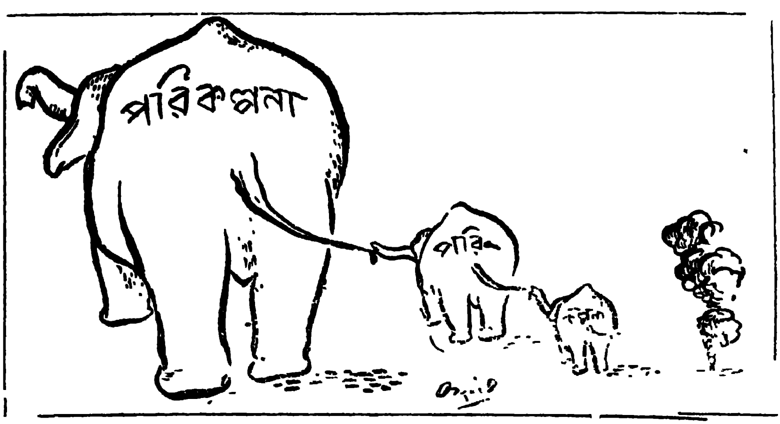
দিদিমণিদের দেখেই —

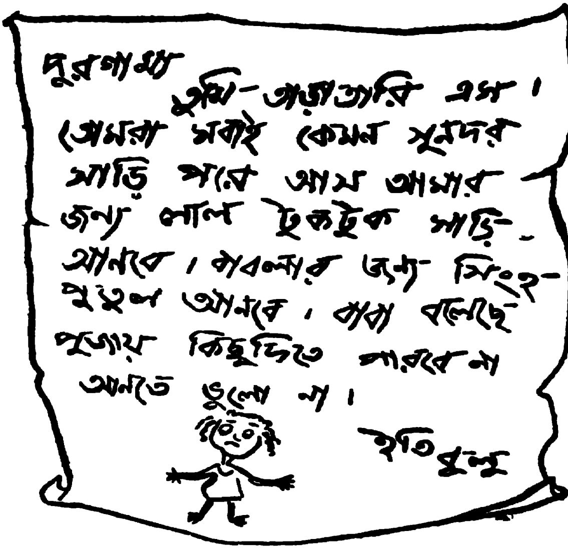


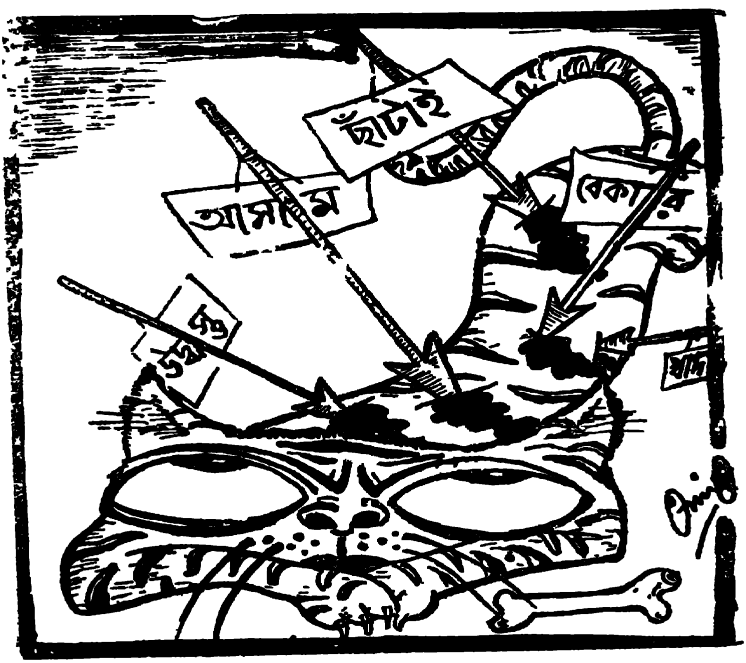
ইষ্টবেঙ্গল না মোহনবাগান ?

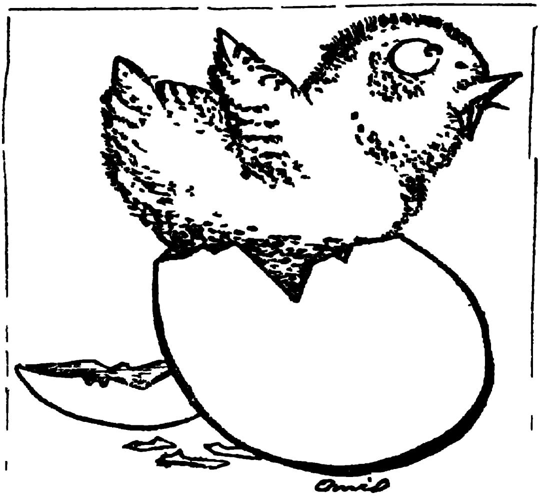


বাঙালীর নেশা ও পেশা




পুরণাম্য
তুমি-তাড়াতাড়ি এস।
তোমরা সবাই কেমন সুন্দর
সাড়ি পরে আস আমার
জন্য লাল টুকটুক সাড়ি-
আনবে। বাবলার জন্য সিংহ-
পুতুল আনবে। বাবা বলেছে
পুজোয় কিছু দিতে পারবে না
আনতে ভুলো না।
ইতি বুলু


ছাঁটাই
আসাম
বেকার

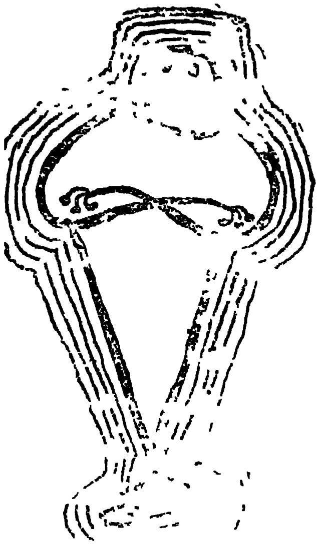


অবাক পৃথিবী

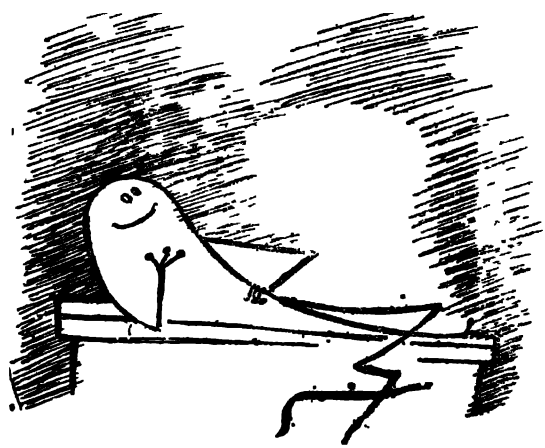


শিল্পীর খেয়াল

ব্যঙ্গ-চিত্র-শিল্পী বা লেখক মাত্রেই সব কিছু বাঁকাচোখে এবং অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁদের মনটা প্যাঁচোয়া কিনা জানিনে, তবে মগজের প্যাঁচটা বোধকরি ঢিলে। এখানে স্বনামখ্যাত ব্যঙ্গ-চিত্র-শিল্পী 'ওমিও' তাঁর খেয়াল-খুশি মত কতকগুলি আজগুবী ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন—যা আমবা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারিনে—কারণ এদেব প্রত্যেককেই আমবা চিনি।



কাবুলী-জাতীয

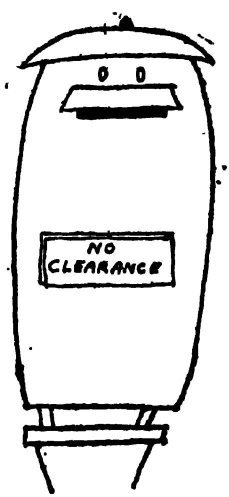


ভৃত্য

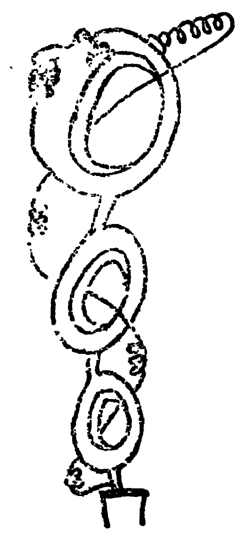
(স্বামীব চেয়েও দামী)



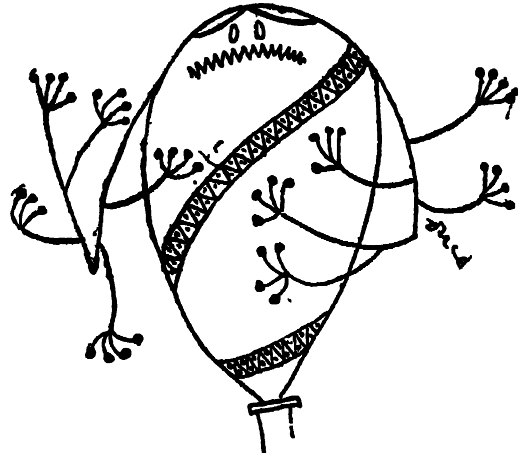
দশটা-পাঁচটা



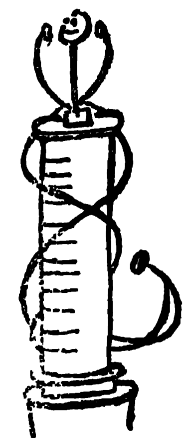
সম্পাদকের
দপ্তর



বেতার-শিল্পী



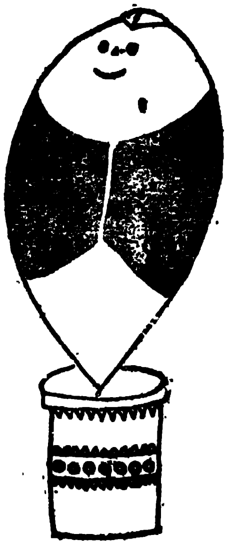
গৃহিণী (দশভুজা)



সুঁই



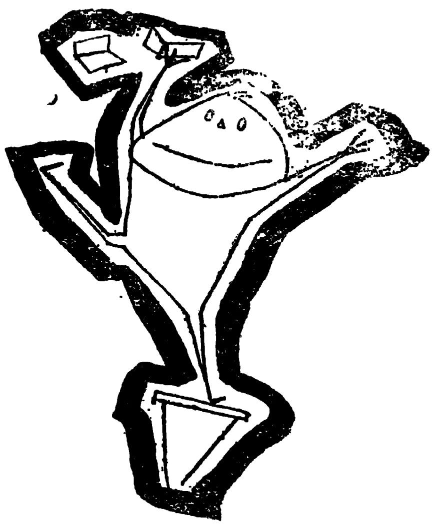
বংশ-
-ধর ও -ধরী



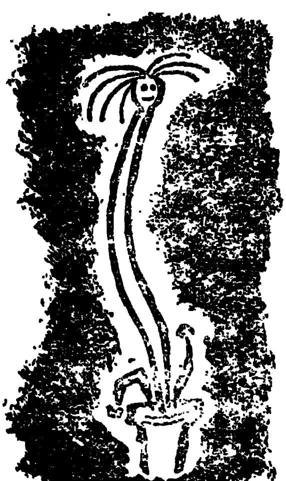
কালোবাজারি



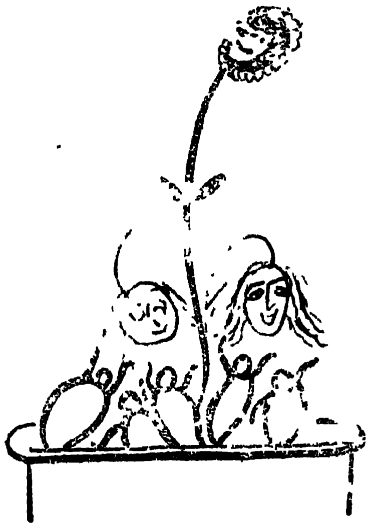
খোর আফিসার -



বে-পড় য়া



রোমান্টিক কবি

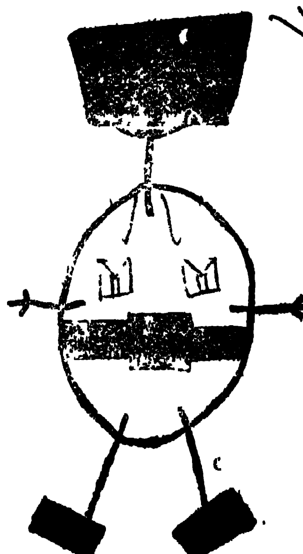


ফিল্ম-ষ্টারিকা

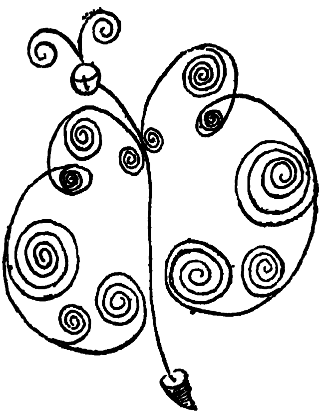




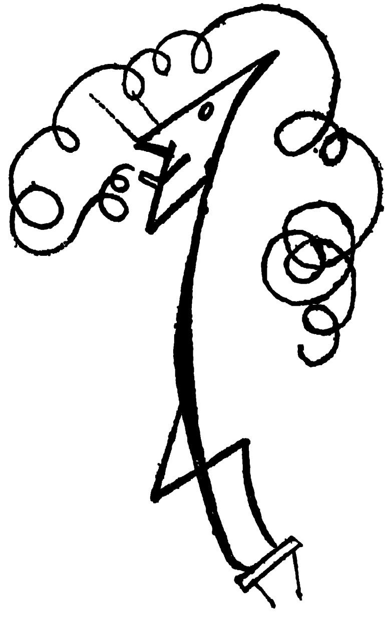
কর্তা
(সমস্যা আর সমস্যা)



কনিষ্ঠ-বলী



হালের
প্রজাপতি



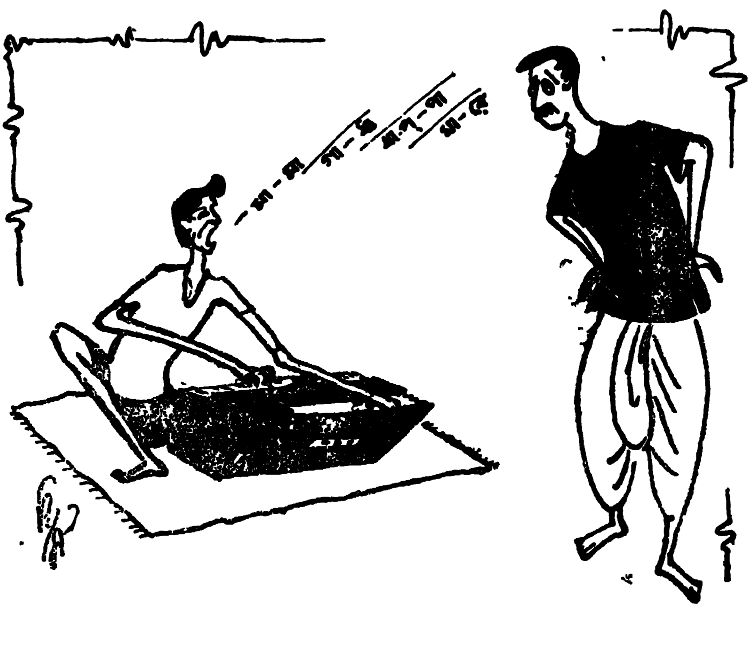
দা'
(পাড়াভুতো)



গভীর
জলেব মাছ

বিমান মল্লিক

বি, এ। বয়স—২৫। সৌখীন। সুশ্রী চেহারা। অর্থাভাব নেই। হাওড়াবাসী। পেশা—তুলিচালনা। নেশা—গানবাজনা, ডিবেটিং। শিল্প-কর্ম: ষ্টেটস্‌ম্যান, ছোটদের পাততাড়ি (যুগান্তর), যষ্টিমধু ইত্যাদি। বর্তমান অধিষ্ঠান: লণ্ডন। কার্টুন ও পাবলিসিটি শিক্ষার্থী। অর্থাৎ পাত্র হিসেবে ভাবা-দর উর্ধগামী, অবশ্য ইতিপূর্বেই পাত্রীস্থ কিনা দায়গ্রস্থরা খোঁজ নিতে পারেন।



সুভাষ সিংহরায়

গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে চারুশিল্পের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত হলেও ব্যঙ্গরেখাচিত্রে কিছুদিন 'সু' নামে তুলিতে হাত লাগিয়েছিলেন এবং তাঁর আঁকা ছবিগুলি 'কু' হতো না নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু তিনি কেন যে হঠাৎ ডুব দিলেন জানি না। তবে বর্তমানে ব্যঙ্গচিত্রের নেশা কাটিয়ে পেশা হিসাবে তুলি ধরেছেন কমার্শিয়াল আর্ট বা ব্যবহারিক শিল্পে।



একটি আগামীকালের দৃশ্য—পথে



ভাদু-ভাই

আমার পিতৃদত্ত নাম শ্রীরামকৃষ্ণ ভাদুড়ী। ছদ্মনাম—ভাদুভাই। জন্ম—ফরিদপুর জেলায়। শিক্ষা—রাজসাহী, কলকাতা, শান্তিনিকেতন। পেশা—পাবলিসিটি: সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ; অর্থাৎ, মসী-কীর্তন। কার্টুন পত্রস্থ: স্বাধীনতা, সচিত্র ভারত, গড়ের মাঠ, মহিলা, অচলপত্র প্রভৃতি পত্রিকায়। প্রাক্তন সম্পাদক: 'ক্রিকেট জগৎ', 'স্বদেশ ও শিল্প' এবং 'মোহনবাগানেব ইতিকথা' নামক গ্রন্থেব গ্রন্থকার।



রাজাগোপালাচারীর উক্তি: 'মধ্যবিত্তেরা ঢোলের মত দুধারে চাঁটি খেতেই অভ্যস্ত...'



রাজনীতি



দেয়ালটা বড্ড খালি খালি দেখাচ্ছিল কিনা তাই—

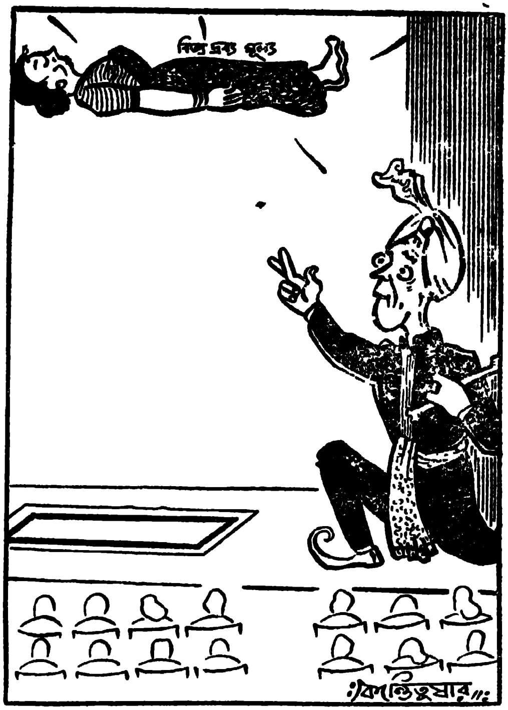


কান্তিতুষার

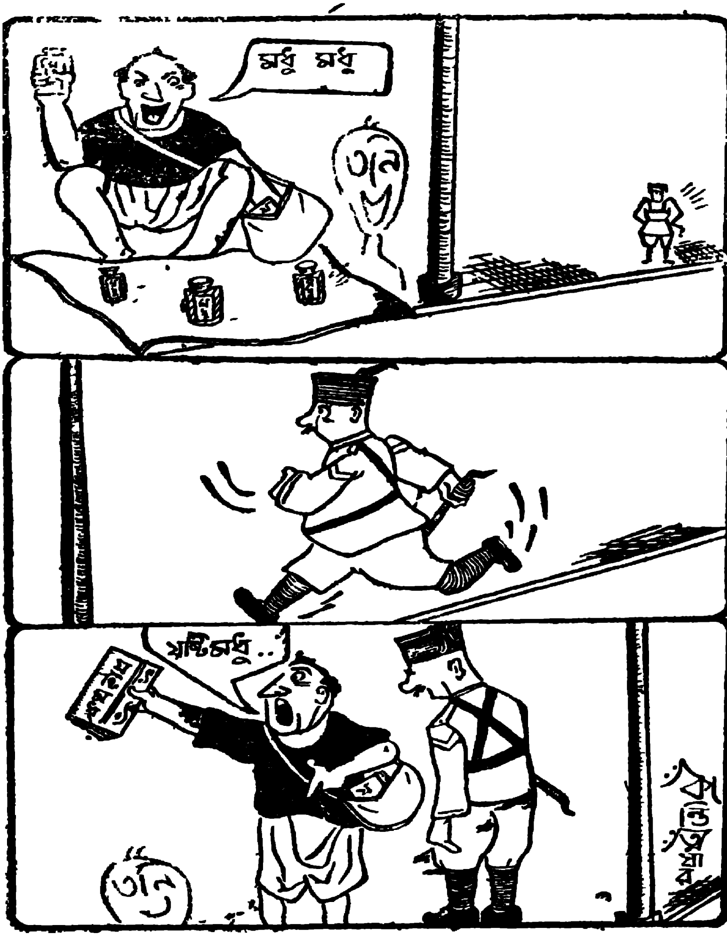
নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরুদ্ধ হয়েছি বলে নিজেকে তৃপ্ত অনুভব করছি; এবং খানিকটা গর্ববোধও হচ্ছে বলতে পারি। কিন্তু আমার মত সাধারণের আত্মকথা তো জিজ্ঞাসার অবকাশই রাখে না। এবং তা' হাটের মাঝে প্রচারযোগ্যও নয়। আমি মনে করি, শুধুমাত্র ক্রান্তদর্শী মহাপুরুষদেরই জীবন-চরিত বলে কিছু থাকে। তবুও যখন সস্তা 'পদ্মভূষণের' কালে আমার চলাফেরা, তখন পারিপার্শ্বিককেই মানতে হবে। একথা বলছি, কারণ দেখছি চিত্র-নটদের 'ঘটনাবহুল' জীবন নিয়ে একাধিক জীবনীকার ব্যস্ত; কিন্তু পাশের বহু প্রতিভা অপরিচয়ের আঁধারে অবহেলিত।

সত্যি বলতে কি, আমার দৈনন্দিন জীবন অত্যন্ত সরল এবং সহজ। অনন্যসাধারণ কিছু নয়। উল্লেখ্যও কিছু নেই। আমার বিশ্বাস, জীবনী সকলের থাকে না, সকলের হয় না। তবুও, আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আমি না জানিয়ে পারছি না সাহিত্যিক শ্রীকুমারেশ ঘোষকে। তাঁর প্রেরণা ও আশ্বাস না পেলে এ লাইনে আসা হ'ত কিনা জানি না এবং তাঁর মহানুভবতার কথা বিস্মৃত হয়ে আমি যেন অকৃতজ্ঞ না হই।

★


কান্তিকুমার


আধুনিক
উপন্যাস
রবীন্দ্র রচনাবলী
কান্তিকুমার


মধু মধু
খাঁটিমধু..



'অ-গুপ্ত'

'সুইটমধু'র সম্পাদকের
আদেশ মাইন্স কইর‍্যা,
আঁইক্যা দিলাম মূর্তিখানা
ত্থাখেন নয়ন ভইর‍্যা।
আপন কথা কি আর অ্যামন,
কওয়ার কিছুই নাই,
তবু য্যাখন হুকুম হৈছে—
কিঞ্চিৎ কইয়্যাই যাই :

জন্ম, আদিনিবাস—পু-বঙ্গ ; হাল সাং—প-বঙ্গ। বয়স যদিও অর্ধশতোত্তর তবু সামাজিকতঃ, বিজ্ঞানতঃ এবং আইনতঃ 'অবিবাহিত'। অর্ধ-আমিষাশী (মাংস চলে না, মাছ ডিম চলে), দুগ্ধবিমুখ। সম্ভাব্য মৃত্যু (নিজমতে)—স্টেটবাসের তলায়।

ভালো লাগে : নস্যি, সাইকেল, আলু-পোস্ত। ঝাল নোস্তা, মিষ্টি-মধু। রঙ্গব্যঙ্গ-কৌতুক। ইংরাজী হাসির আর হিন্দী 'গাঁজা'র সিনেমা। আমেরিকান ছবির-ম্যাগাজিন। উড়ে যাত্রা। বারো হাত তফাতে মারামারি। দশ হাত তফাতে সুন্দরী নারী। ছ' হাত তফাতে দুরন্ত ছেলেমেয়ে। আর একেবারে কাছে ভদ্র, হাসিখুসি বোকাপ্রকৃতির লোক।

ভালো লাগে না যা, তা বললে অনেক বন্ধুই হয়তো শত্রু হবেন, কাজেই সেটা থাক।

প্রাক্-চল্লিশে প্রায় সকলরকম খেলাধুলায় এবং গানবাজনা-অভিনয়াদিতে বিশিষ্ট অংশগ্রহণ

যৈবনকালে যৈবনধম্মে হৈছে নানান্ বাই,
নাটক করছি গীতও গাইছি হৈ-চৈর কামাই নাই।
খেলছি ধুলছি রঙ্গে মাতছি লেখাপড়াও কইর‍্যা,
খাওন ভুইল্যা আড্ডাও দিছি ঘণ্টা ঘণ্টা ধইর‍্যা ॥

সেই সঙ্গে ছবি আঁকা আর সাহিত্য চর্চাও চলেছে কিছু কিছু। বিশেষ ক'রে রঙ্গব্যঙ্গ-রচনা আর কার্টুন-ক্যারিকেচার, এই দুটোতে বরাবরই অধিকতর আসক্তি।

ছবি আঁকন গল্প ল্যাখন এই যে বাতিক দুইট্যা,
ক্যাম্নে য্যান ভুতের লাহান্ কান্ধে গ্যালো জুইট্যা।
কি আর করি লাইগ্যা গ্যালাম ভুতেরগো খ্যাদ্মতে,—
শ্যাষে যাইয়্যা নিষ্কিতি পাই দশটা বচ্ছর গতে ॥

লেখার প্রথম প্রকাশ, প্রায় পঁচিশবছর আগে, শারদীয়া আনন্দবাজারে; রেখার, প্রায় বিশ বছর আগে, সচিত্র ভারতে। তারপর থেকে ছোটদের-বড়দের প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর বিভিন্ন ইংরাজী ও বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকাদিতে গল্প, কবিতা, ব্যঙ্গরচনা এবং রেখাচিত্র। ছবি আঁকতে যেটুকু ক্ষমতা হ'ল, তা নিজের থেকেই—কোন সাহায্য ব্যতিরেকেই।

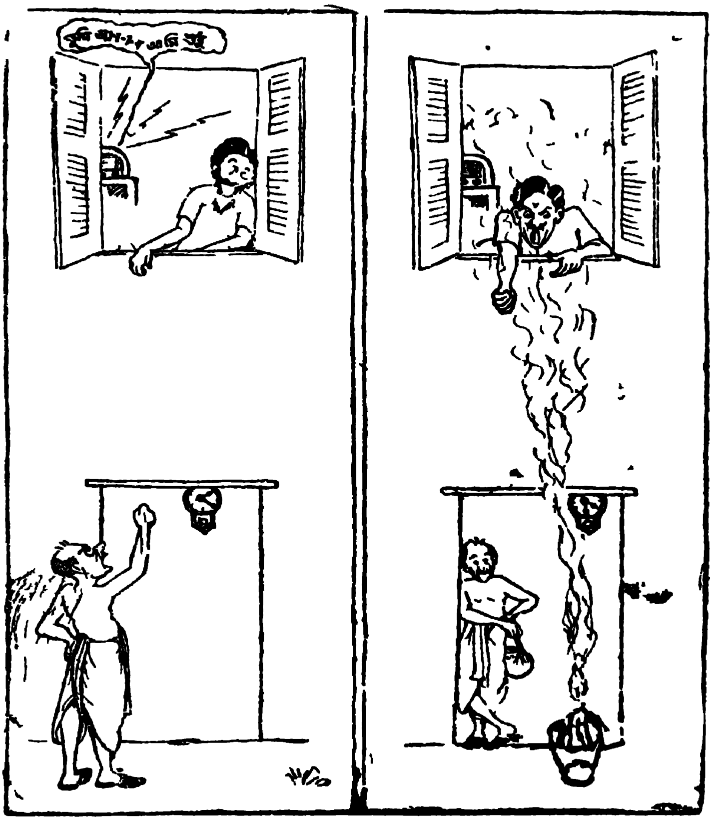
বছর দশেক এমনি কাটবার পর—

আথাল পাথাল চুবনি খাইয়্যা সংসার ঘুর্নি-পাকে,
'ধুত্তার্' কইয়্যা থুইয়্যা দিলাম কলম তুলি তাকে।
অনেক বচ্ছর কাইট্যা গ্যালো মানুষ গ্যালো চান্দে,
আমি আবার পইড়্যা গ্যালাম জোড়া ভুতের ফান্দে ॥

অর্থাৎ, প্রায় বছর পনেরো একদম নির্বিকল্প চুপচাপের পরে, হঠাৎ একদিন—

গড়পারের শ্রীঘোষকুমারেশ অতি রসিক জন,
তারই ফ্যারে পইড়্যা পুনঃ চুলকানিতে মন।
সেই কারণে মইধ্যে মইধ্যে জাইগ্যা ওঠে বাই,
(আর) আপনাগোর ওই ছিরুচরণে পের্ণতি জানাই ॥

★



জবাব।



—অভ্যেস দাদা! আগে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতাম গোটা ইলিশ, এখন পুঁটি—হেঁ হেঁ—



আমাদের বল : যন্ত্র নয় মন্ত্র



টা-টা-

জিভি

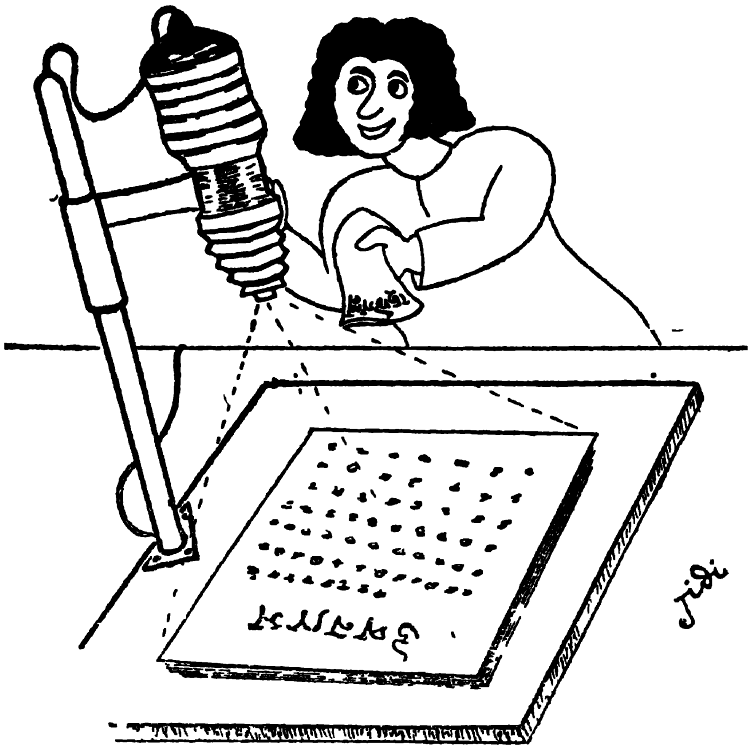
আমি আসলে আলোকচিত্রকর। এই নামেই বেশি পরিচয়। ইউনিভার্সিটির কোন ডিগ্রী নেই। কানে আবার খাটো। আর এক পরিচয় আছে—ব্যাঙ্কের কেরাণী। আর অখ্যাত গরীব কেরাণী পিতারই পুত্র। কোলকাতায় জন্ম, প্রায় চল্লিশ বছর আগে। নিজের চিত্ররূপটা নিচেয় দিলাম। কার্টুন আঁকা সখ খুব বেশি দিনেরও নয়। 'জিভি' সংক্ষিপ্ত নাম। 'যষ্টি-মধু'ই এই নামের একমাত্র প্রেরণাদাতা—অন্তত গৌর দত্ত তাই মনে করেন।





—এটা কী হচ্ছে ?

—লেখাটা ভুল হয়ে গেছে তাই রবার দিয়ে তুলছি—



এন্‌লার্জার।



সেনইয়েট

ছবি আঁকার ঝোঁক আমার ছোট বেলা থেকে। আর্ট কলেজে পড়বারও ইচ্ছা ছিল, পুরণ না হবার কারণ, যা স্বাভাবিক— অর্থাভাব। যুগান্তরে কাফি-খাঁর কার্টুন দেখে-দেখে বা টুকে-টুকেই কার্টুন শেখা। পরে আঁকা ছবি পকেটে নিয়ে-নিয়ে পত্রিকা অফিসের দরজায়-দরজায় ঘোরাই ছিল কাজ। শেষ পর্যন্ত ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে। হাতে খড়ির আট বছর বাদে আমার প্রথম কার্টুন ছাপা হলো 'স্বাধীনতা'য়। পরে যষ্ঠি-মধু, সচিত্র ভারত, বিংশ শতাব্দী, ষ্টেডিয়াম, খেলার কাগজ ইত্যাদিতে আমার বাঁকা-তুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। সামাজিক কার্টুনের চাইতে মাঠের খেলা-ধুলোর দিকেই যেন আমার তুলির ঝোঁক।




সোভিয়েট
মরিতে চাহি না আমি
সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি
বাঁচিবারে চাই



সুফি

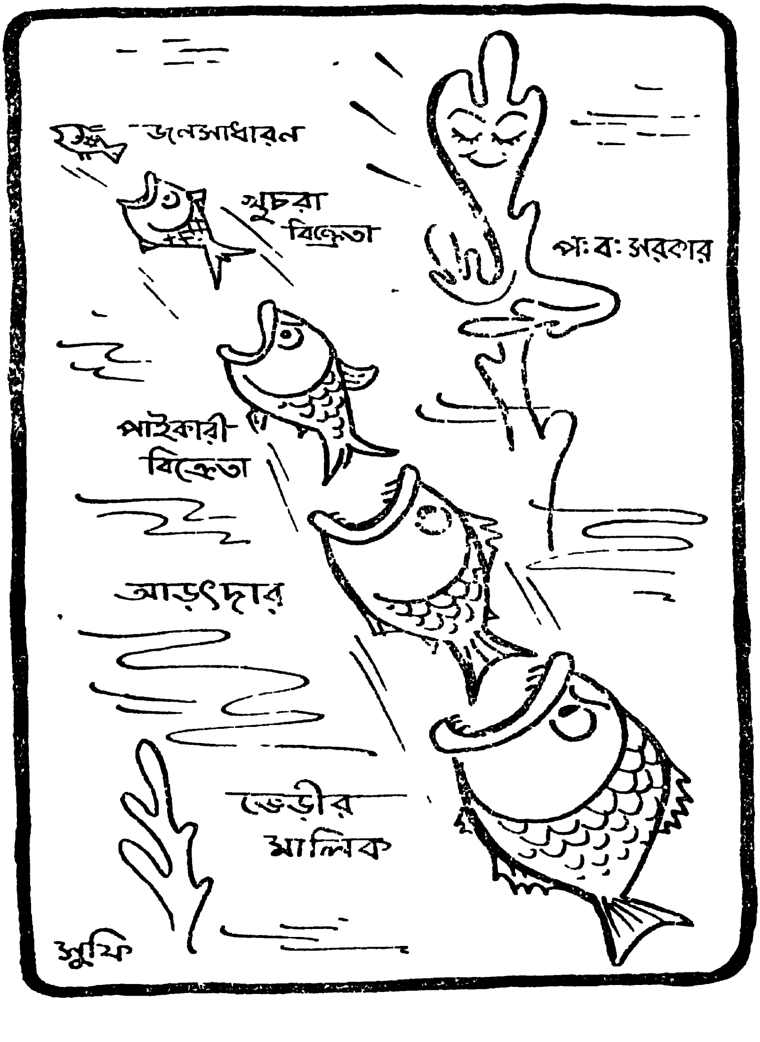
সম্পাদক আমার জীবন-চরিত জানতে এত আগ্রহী হলেন কেন তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। পথে ঘাটের যে কোন একজনকে ডেকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে যা বলত, আমার নামে তা চালিয়ে দিলেও বিশেষ কিছু রকমফের হ'ত না। তারই মাঝে বিশেষ কয়েকটি কথা যুক্ত করলে 'সুফি' নামধারী ব্যক্তিটি স্পষ্ট হবে। ভদ্দরলোকের ছেলেরা এদেশে লেখাপড়া করে, সেই সাবেকী ধুয়ায় বাবা যতোটা ঠেকা দিতে পেরেছিলেন ততোটা করেছিলাম। কলেজ পার হবার সুযোগ পাইনি। হলেও কি আর হ'ত এমন। ঋণী আমি সবার কাছেই। কিন্তু গুরু আমার কেউ নেই, বোধহয় আমি নিজেই নিজের গুরু। জীবনকে যেমনভাবে পাব বলে ভেবেছিলাম তেমনিভাবেই আঁকা শুরু করেছিলাম ছেলেবেলায়। তারপর তা হারিয়ে যেতে যেতে জীবন যেমনভাবে চলছে তাকেই আঁকা শুরু করলাম। লোকে বলে, বিদ্রূপ করি আমি, ব্যঙ্গ করি, বাঁকা চোখে দেখি। আমি মনে করি, স্বচ্ছ চোখে দেখি। শারদীয় গড়ের মাঠ পত্রিকায় প্রথম কার্টুন প্রকাশিত

হ'য়েছিল। তারপরে, যষ্টিমধু, প্রহরী, যুগান্তর, সচিত্র তোমার জীবন, রঙ্গকথা, সংগীতিকা, সচিত্র ভারত, বসুমতী প্রভৃতিতে। 'স্বাধীনতা'তেই আমি প্রথম রাজনৈতিক কার্টুন আঁকতে শুরু করি। যিনি আমাকে কার্টুন আঁকা সম্পর্কে পরামর্শ, উপদেশ এবং সাহস দিয়ে সব সময় সাহায্য করেছেন এবং আজও করছেন, তিনি হলেন 'স্বাধীনতা'র শ্রীঅরুণ রায়। আমার পরম শ্রদ্ধেয় 'অরুণদা'।





আবৃত্তিতে 'সঞ্চয়িতা', গানে 'গীতবিতান'
চাই-ই, নইলে যায়-যায় তান এবং মান।


জনসাধারন
খুচরা বিক্রেতা
পা: ব: সরকার
পাইকারী বিক্রেতা
আড়ৎদার
ভেড়ীর মালিক
সুফি

নরেন রায়

পূর্বপুরুষরা বাদশা বা সুলতানের কাছ থেকে কিছু উচ্ছিষ্ট পেয়েছিলেন—'রায়' পদবী। সেই নামাবলী গায়ে দিচ্ছি ২৪টা বছর। আর নাম 'নরেন' বা 'নরেন্দ্র'—সেও তো জীবনের এক ব্যঙ্গ। তাছাড়া, এখন নেশা পেশাও রূপ নিয়েছে ব্যঙ্গ লেখায়। কাজেই স্বরূপ প্রকাশ করবার মত বা বলবার মত আমার কি-ই বা আছে!

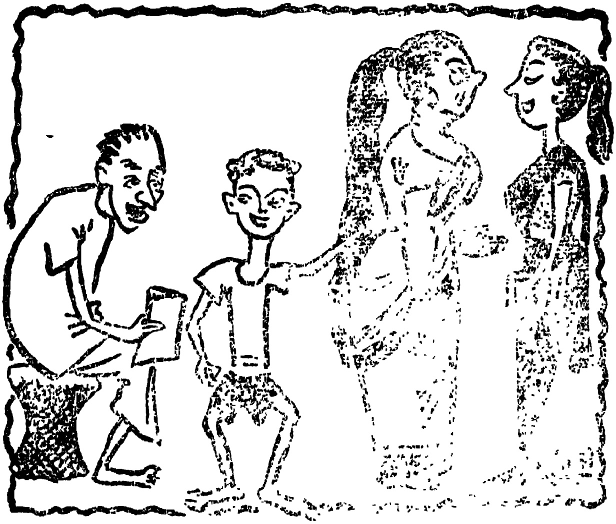




শতদল

খুব ছোট বয়স থেকেই ছবি আঁকার দিকে বেজায় ঝোঁক ছিল। ঘরের মেঝে আর খড়িমাটি ছিল আমার ছেলেবেলার সঙ্গী। তারপর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শ্লেট পেন্সিল ও পরে খাতা-পেন্সিল সঙ্গী হ'ল। তবে কার্টুনিষ্ট হবার কল্পনাও কোনদিন ছিলনা। কার্টুন দেখতাম, ভালো লাগতো, কিছু কিছু বুঝতামও, কিন্তু কার্টুন আঁকবার প্রেরণা কোনদিন পেতাম না। ফাইন ও কমার্শিয়াল আর্টের সমুদ্রে তখন হাবুডুবু খাচ্ছি। গল্প ইত্যাদির ইলাস্ট্রেশান করবার সময়ে ছবিগুলো ব্যঙ্গচিত্রের দিকেই ঝুঁকতো বটে, কিন্তু পুরোপুরি কার্টুন সেগুলোকে বলা যেতো না। কার্টুন আঁকবার কথা আমাকে যিনি প্রথম বলেন, তিনি - কুমারেশদা— কুমারেশ ঘোষ। তাঁর সরস কৌতুক-পত্রিকা 'যষ্টি-মধু'তেই আমার আঁকা কার্টুন প্রথম ছাপা হয় ১৯৫৫ সালে। পরে যে সকল পত্র-পত্রিকার সংস্পর্শে ধীরে ধীরে আসি তাদের মধ্যে কতকগুলি নাম করা যেতে পারে—ভারতবর্ষ, সচিত্র ভারত, নবকল্লোল, সচিত্র তোমার জীবন, নতুন খবর, প্রহরী, মেয়েদের কাগজ, রূপলেখা, ইত্যাদি।


DANGER
440 VOLTS



[illegible]



—কাঁহে চিল্লাতা ?   নাম্বার লে লেউ !


উদ্বাস্তু-প্রবাহ
পাকিস্তান হইতে
আসাম হইতে
কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তর
সিট নাই
COLLEGE



চক্রধর শর্মা

বাঃ, তুমি তো বেশ আজগুবি ছবি আঁকো। তুমি এক কাজ কর কার্টুন আঁকো।—আমাকে উদ্দেশ্য করে বিখ্যাত বিজ্ঞাপন চিত্রশিল্পী অন্নদা মুন্সি বললেন

প্রথমে খানিকটা হকচকিয়ে গেলাম। আমার খাতাপত্র, অর্থাৎ বড় ঠোঙা ছেঁড়া, মোটা কাগজ সমান করে কেটে নিয়ে তৈরি করেছি। ইস্কুলের অঙ্কের খাত টাতেও অঙ্ক না কসে, স্কেচ খাতা করেছি। তাতে হাবিজাবির মাথামুণ্ডু কি এঁকেছি নিজেই জানিনা, এই সমস্ত বগলদাবা করে একদিন হঠাৎ উপস্থিত হয়েছিলাম তাঁর কাছে। উদ্দেশ্য চিত্রশিল্পী হব। পড়া

শোনাতে মোটে মন ছিল না। রাতদিন ছবি আঁকতাম নিজের খেয়াল খুসিমত। ছবিগুলিতে হয়তো কার্টুনের কোন ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন উনি। কিন্তু কার্টুন কাকে বলে, তা তখনো বুঝতে শিখিনি, অতএব হঁা করে রইলাম। উনি মৃদু হেসে কার্টুন জিনিসটিকে সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলেন এবং বিলিতি কার্টুনের কিছু বই দিয়ে বললেন, এগুলি দেখ, তাহলেই বুঝতে পারবে। তারপর একদিন উনি কতকগুলো কার্টুন বেছে দিলেন এবং ওর কথা মত অনেক পত্রিকাতেই পাঠালাম, কিন্তু মাসের পর মাস প্রতীক্ষাই সার হল, কোন কাগজই কোন ছবি ছাপল না।

একদিন ওঁর বাড়ীতে বসে আছি। এমন সময় সেখানে এলেন রঘুদা বা প্রখ্যাত শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী। রঘুদাকে আমার কার্টুন ছবি উনি বেশ উৎসাহভরে দেখিয়ে বললেন, দেখ রঘু, ছেলেটির কার্টুনের হাত বেশ ভালে। রঘুদা সব দেখে বললেন, এক কাজ কর; তোমাকে একটা কাগজের ঠিকানা দিচ্ছি তুমি সেখানে গিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা কর। আমার মনে হয়, উনি তোমার ছবি কিছু ছাপতে পারেন।

একদিন টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, গিয়ে হাজির হলাম সেই পত্রিকা অফিসে। সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হল, প্রথমে তাঁর গুরুগম্ভীর মূর্তি দেখে, ইস্কুলের হেড মাষ্টারমহাশয়ের বেত্র আস্ফালনের ভয়ানক সেই দৃশ্যের চিত্রটি ছায়াছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভয়ে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। বসো। হঠাৎ ওঁর স্নেহের মিঠে গলা শুনে খানিকটা ভরসা পেলাম, তারপর একে একে সমস্ত ছবি উনি দেখলেন, এবং দেখে প্রাণ খুলে হো হো করে হাসলেন। এবার আমার সমস্ত ভয় কর্পূরের মত উবে গেল। উনি কিছু ছবি বেছে নিলেন। বললেন ছাপব, তবে এরপর যে ছবি আনবে, এর চেয়ে আরো ভালো হওয়া চাই কিন্তু। পরের মাসে কার্টুন ছাপা হল। ওঃ সে কি আনন্দ! পত্রিকার নামটা বলেই ফেলি, যষ্টি-মধু। সম্পাদক এখন আর শুধু সম্পাদক নন, উনি এখন আমাদের কুমারেশদা।

অনেক দিন কেটে গেছে, অনেক কাগজে এখন কার্টুন ছাপা হয়, কিন্তু সেই প্রথম কার্টুন ছাপার মত আনন্দ আর পাই না। কুমারেশদার কথা মতই নকল নাম নিয়েছি, চক্রধর শর্মা। জানিনা কেন কার্টুন আঁকি। আঁকতে ভালো লাগে, শুধু সেই জন্যেই বোধহয়।

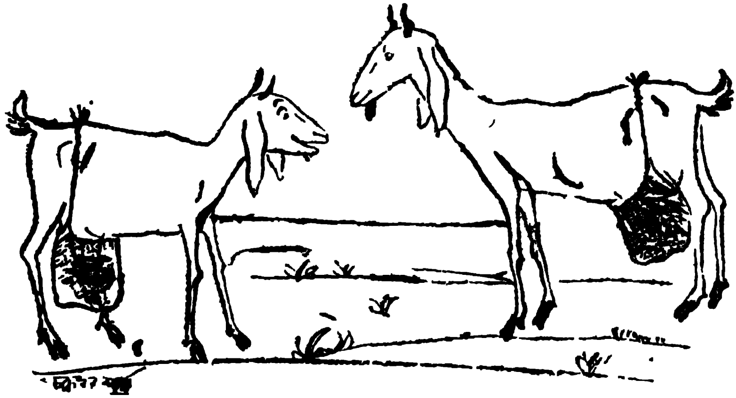


টাকা নিষ্প্রয়োজন

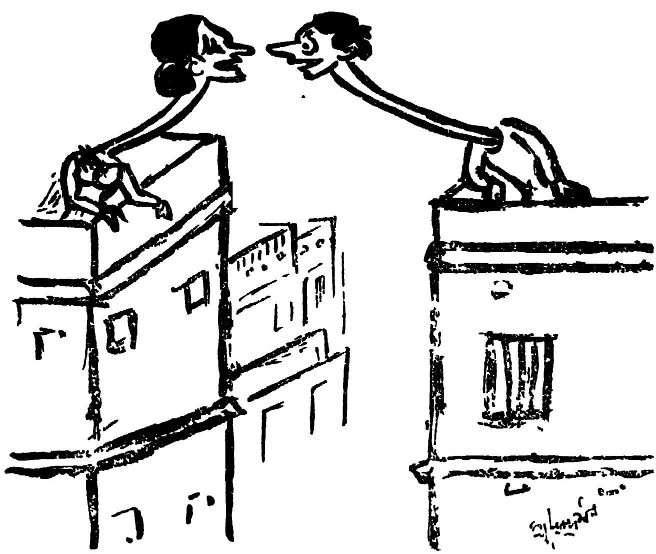




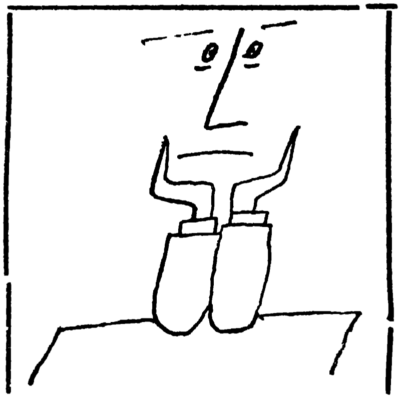
পরিপূরক



হাল-ফ্যাসান



আহা, যদি এমন হতো।



কৃশ

সাহিত্যের বাজারে যেমন চুরি-ডাকাতি চলে, কার্টুনের ক্ষেত্রেও তেমনি এ ব্যাপারটা অচল নয় বুঝেই বিলিতি কার্টুনের কোট-প্যাণ্ট বা স্কার্ট ছাড়িয়ে তাকে বেমালুম ধুতি-পাঞ্জাবি বা শাড়ি পরিয়ে শিল্পী-যশোপ্রার্থী হবার চেষ্টায় আছি। এমন কি আমার নিজের চেহারার কার্টুনটিও '—'মাল। আমার আসল নাম-ধাম অনেকেই জানতে চান—হয়তো আমার কাছে এই 'মহাবিদ্যা'টি শিখে আমার ভাত মারবার জন্যে। তাই গা ঢাকা দিয়েই আছি। আর দু'গালে হাত দিয়ে কেবলই ভাবছি আমার মত কবিৎকর্মা পুরুষ আর আছে কিনা বা গজাচ্ছে নাকি এবং গজালেও তারা এ বিদ্যের কথা আমার কাছে স্বীকার করছে কিনা।



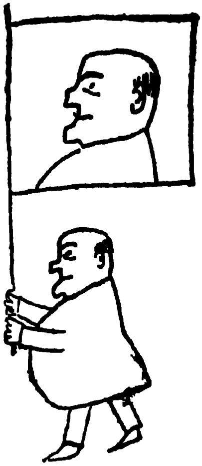
মনোযোগী।



শেষ পর্যন্ত



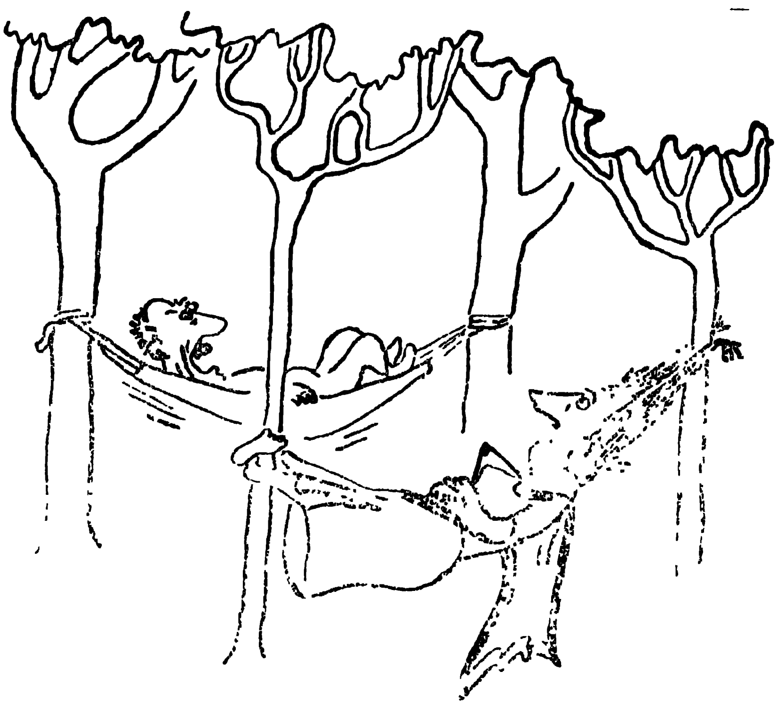
ভদ্রমহিলা আগে নাকীসুরে গান গাইতেন



আত্মস্তুতি



বনেদি ঘর



আমিও পারি

অর্ধেন্দু

অর্ধেন্দু বর্তমানে অমাবস্যায় পরিণত। তাই অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আজো এঁর খোঁজ পাইনি আর। এত অতুলনীয় টান যাঁর, তিনি কিসের টানে গা ঢাকা দিয়েছেন কে জানে! এঁকে বলি, পুনরাগমনায় চ।



ভবিষ্যৎ ?

চিত্ত



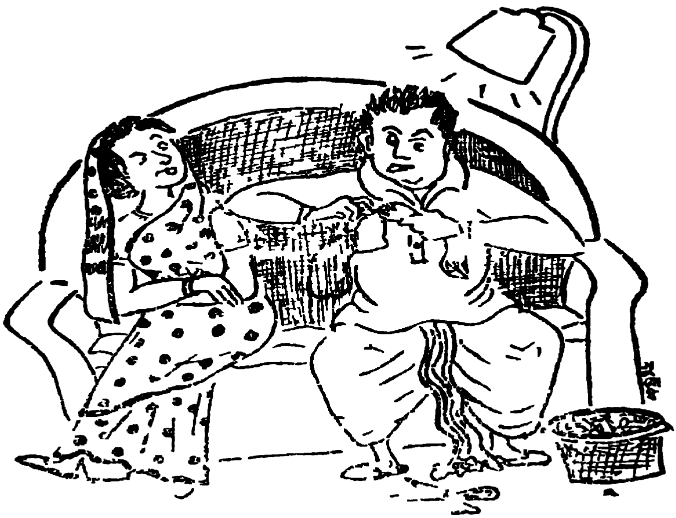
আমি সরকার। না না, আপনাদের সরকারী সরকার নই, সামান্য চিত্রশিল্পী। তবে ভারত সরকারের আওতাতেই আছি। গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজ থেকে তকমা নিয়ে বেরুলেও, ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পের দিকে মন কেমন ছোঁক-ছোঁক করে। শিশুসাথী, বিংশশতাব্দী, দর্শক, বিশ্ববাণী, নবনারী, ইত্যাদি পত্রিকায় গল্পে প্রবন্ধে চিত্রকর্ম করা এবং বইয়ের প্রচ্ছদপট আঁকায় অভ্যস্ত, তবে 'যষ্টি মধু'র পাল্লায় পড়ে বাঁকা-চোখে দেখতে এবং তুলি টানতে শুরু করেছি। আঁকার নেশায় দেশ ভ্রমণের নেশাও দেখা দিয়েছে। চিত্রশিল্পে হাতে খড়ি এবং উৎসাহ পাই দেবুদা'র (প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়) কাছে। এবং সেই থেকে এ লাইনে কু-ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করছি।



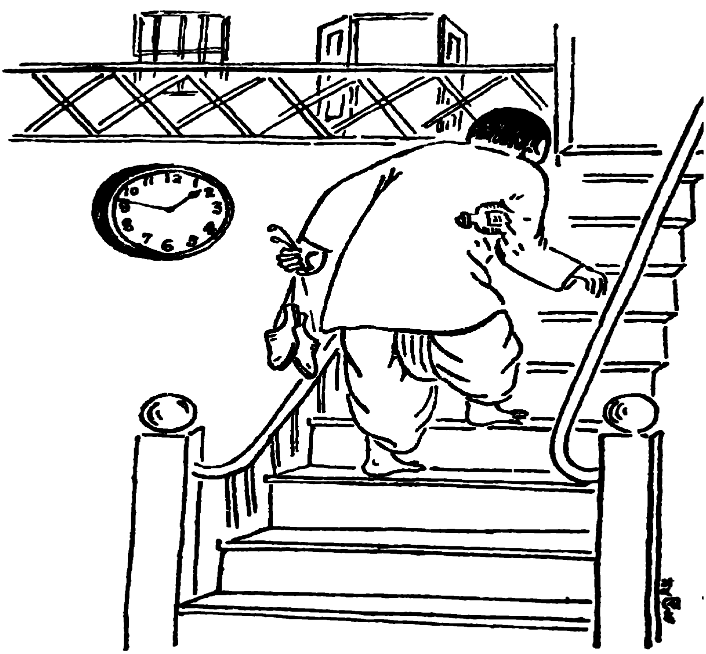
ঐ সব খটমট লেখা ছেড়ে সিনেমার গল্প লেখো দেখি—নামও হবে, পয়সাও হবে।



-পাক-প্রণালীর Made Easy আছে,
মানে, পুরুষদের জন্যে ?



শুধু সংসারের জুট ছাড়ালেই চলে না।



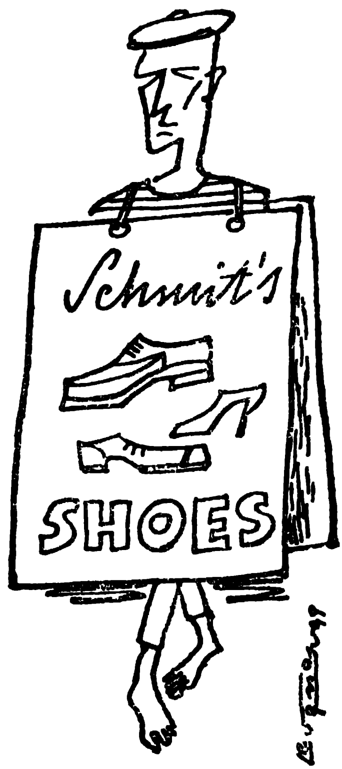
'ধীরে রজনি, ধীরে।'

আন্তর্জাতিক
কার্টুন

আজকের দিনে বিদেশী কার্টুনিষ্টরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখছেন তারই কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো।

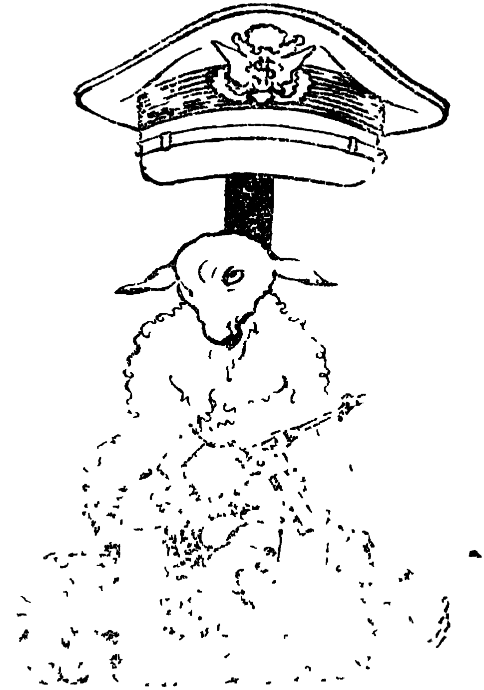
[শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের এবং শেষে দু'খানি কুমারেশ ঘোষের সংগ্রহ থেকে]

★



শিল্পী : ডেড্, লেন গ্রেন
(পোল্যাণ্ড)

জুতো—পায়ে না বুকে।



একটি বাস্তবরূপ—সর্বদেশেরই (হাঙ্গেরী)



এ অবস্থা আজ শুধু আমেরিকায় নয়—সর্বত্র (চীন)



মিছিল

শিল্পী : ফ্রাঁস মাশেরেল
(বেলজিয়াম)



সভ্য কারা ?

শিল্পী : হানসো (জার্মানী)



শিল্পীর নাম অস্পষ্ট
(লেবানন, আরব)

ভারত বাহিরের দেশের নগ



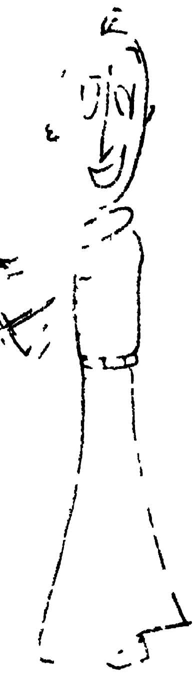
নিউ ইয়র্ক টাইমস্
(১০- -৫৬)

আমেরিকার চোখে আমরা।

কিঞ্চিৎ

লেখনী-প্রসূত

কার্টুনীয় আলোচনা



শৈল চক্রবর্তী, হিমানীশ গোস্বামী, চণ্ডী লাহিড়ী,
সন্তোষকুমার দে ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়



কার্টুন চলচ্চিত্রের কথা

শৈল চক্রবর্তী

প্রায় অর্ধশতাব্দীর বেশি হলো কার্টুনফিল্ম তৈরি আবিষ্কার হয়েছে। এই দীর্ঘদিনে এই পদ্ধতির অনেক উন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এর নির্মাণ কৌশলের মূলতত্ত্ব আজও সেই এক থেকে গেছে। যথা, এক একটি ছবি থেকে ধারাবাহিক ভাবে চিত্রগ্রহণ। এই কাজের জন্যে অনেক কিছু জিনিষের অনিবার্য প্রয়োজন হয়, তবে সবচেয়ে যে বস্তুটির বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে অসীম ধৈর্য।

ডিসনির 'থ্রি লিটল্ পিগস্' ছবির কাহিনী আমরা জানি। গল্প মনোনীত হবার পর থেকে নিয়মিত কাজ চলে ছবিটি তৈরি হতে পুরো চারমাস সময় লেগেছিল। এতে ১২৭০০ আলাদা আলাদা ফ্রেম লাগে। অবশ্য অনেক ডুপ্লিকেট এবং আংশিক ছবিও আছে এর মধ্যে। প্রত্যেক ড্রয়িং সময়ের মাপে পরিমিত। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক চিত্রগুলি যখন সেকেণ্ডে ২৪ গতিতে পর্দায় ঝলকিত করা হয় তখন সবটি দেখে শেষ করতে দর্শকদের লাগে মাত্র দু'মিনিট। সুতরাং এই চিত্ররচনা ব্যাপারটি আপাততঃ দুষ্কর বলেই মনে হয়, কেন না হিসাব করে দেখা গেছে যদি একটি লোককে সবগুলি ছবি আঁকতে হয় তাহ'লে প্রতিদিন নিয়মিত কাজ করেও সবগুলি আঁকতে তার সময় লাগবে প্রায় দু'বছর। তারপর আছে সঙ্গীত যেটা এর একটি অতি গুরুতর এবং অতি প্রয়োজনীয় অংশ।

এই দিক থেকে বিবেচনা করেই আমাদের দেশে বিশেষ কেউ এই কাজে এগিয়ে যাননি। ফলে এটি আজও আমাদের দেশে দুঃসাধ্য হয়ে আছে। আমরা এখনও ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে দল বেঁধে বিদেশী কার্টুন ছবি দেখতে যাই। বাধ্য হয়েই বিদেশী ভাষার ডায়ালগ শুনতে হয় আর সেগুলি বাচ্চাদের বুঝিয়ে দিতে হয়। বাধ্য হয়েই অনেক অপরিচিত বিদেশী কাহিনী দেখে উপভোগ করতে হয়। বাধ্য হয়েই নিজের দেশের সম্বন্ধে একটা হীনমন্যতার ভাব

নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়।

আমি বলেছি বিশেষ কেউ এগিয়ে যাননি এই জাতীয় ছবি তৈরির দিকে। তার মানে এই নয় যে কোন চেষ্টাই হয়নি। কয়েকটি ছোট ছোট চেষ্টা হয়েছে কিন্তু কোনোটিই যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত বা শৃঙ্খলাসঙ্গতভাবে হয়নি। বহুদিন আগে বোম্বাই-এর রঞ্জিত মুভিটোন একটি কার্টুন ছবি তৈরি করছে এরকম শোনা গিয়েছিল। এই সংবাদে নিউ থিয়েটার্স একটি ছবি করার জন্যে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় রাতারাতি বললেই চলে শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় 'পি ব্রাদার্স' নামে একটি ছবি তৈরি করেন। 'চিত্রায়' এটি আমরা দেখেছিলাম। তিন চার দিনের বেশি এটি দেখানো হয়নি। তার কিছুদিন পরে রঞ্জিত মুভিটোনের 'জাম্বো দি ফক্স' ছবি কলকাতায় আসে। যাই হোক, প্রথম কার্টুন ছবি তৈরির জন্যে ভারতে নিউ থিয়েটার্সই পাইওনিয়ার হয়ে রইলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

এরপর শ্রীমন্দার মল্লিক কয়েকটি ছবি করতে উদ্যোগী হন। নিজের স্বল্প মূলধনে ও নিজের চেষ্টায় তিনি যে একাজে ব্রতী হয়েছিলেন এতে তাঁর উৎসাহ ও কার্টুনশিল্পপ্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর একটি ছবির নাম 'আকাশ পাতাল'। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একবার প্রচার উদ্দেশ্যে এই শ্রেণীর ছবি ব্যবহার করার সংকল্প করেন। কিন্তু প্রথম ছবিটি রুচিসম্মত মানে পৌঁছুতে না পারায় এ সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি ছোট ছোট চেষ্টা হয়েছে। এর মধ্যে একজন ছিলেন চিত্র পরিচালক। আর একটি গোষ্ঠির কথা জানি যারা আর্ট কলেজ থেকে বের হয়ে যৌথভাবে একাজে অগ্রণী হয়েছিল। কিন্তু এদের পরিকল্পনায় উচ্ছ্বাসই ছিল বেশি আর ছিল সঙ্গতির অভাব, তাই, একে একে দলচ্যুত হতে হতে ওদের পরিকল্পনা বাতাসে মিলিয়ে গেল। এর পরে, আর একটি ভদ্রলোক এইদিকে এসে পড়েছিলেন। যন্ত্র বিষয়ে তাঁর এক সহজাত প্রতিভা ছিল এবং চিত্র সঞ্জীবন কাজেও তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল। 'মিচকে পটাস্' ছবিটি এই ভক্তরাম মিত্রের সৃষ্টি। অবশ্য এর পিছনে আমরা কয়েকজন শিল্পীও ছিলাম। এই ছবির ব্যয়ভার বহন করেছিলেন নিউ থিয়েটার্স।

এই গেল আমাদের দেশের কার্টুন ছবি তৈরির কয়েকটি প্রয়াসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। উৎসাহ উদ্দীপক না হলেও সত্য ইতিহাস। এ

ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষা পেতে পারি যে শুধু ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাস নিয়ে এই কাজ শুরু করলে কাজটি দুরূহই হয়ে পড়বে। যে কোনো বড় শিল্পের মত, যে কোন বড় প্রতিষ্ঠানের মত এই শিল্পকে গড়তে হলে বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি চাই। চাই বড় পরিকল্পনা আর চাই আবশ্যকীয় উপযুক্ত মূলধন। অবশ্য এ চিন্তা করার দায় আমার নয়। এ কাজ তাঁদেরই যাঁদের বিরাট কিছু গড়বার শক্তি আছে এবং তার সঙ্গে আছে সুকুমার কল্পনা।

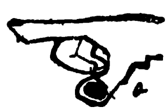
আজ আর কোনো দেশ বাদ নেই। আমেরিকা, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, বৃটেন, পোলাণ্ড—সব দেশেই এক চিন্তা, ছোটদের কি দেওয়া যায়? গান কথা ছবি বই—এই সব আছে তাদের জন্যে। কিন্তু সবগুলিই কি চলচ্চিত্রের মধ্যে ভরা নেই? তাছাড়া আছে রঙ, কাহিনী, আছে শিক্ষা। একসঙ্গে যেটা দেখা ও শোনা যায় তার প্রভাব অনেক বেশি। তাই আজ বইকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে ফিল্ম। ফিল্ম দিয়ে লাইব্রেরী সাজানো হচ্ছে। ছোটদের জন্য সব দেশেই তৈরি হচ্ছে নানান ধরণের ফিল্ম। এমন কি চীনদেশের তৈরি কার্টুন ফিল্মও দেখলাম সেদিন।

ছোট একরিলার দু'রিলার থেকে আরম্ভ করে এখন বড় বড় পুরো দৈর্ঘ্যের ছবিও কম তৈরি হচ্ছে না। আরব্য উপন্যাসের গল্প থেকে পুরো দৈর্ঘ্যের এক অপূর্ব কার্টুন দেখলাম। এটি জাপানে তৈরি। আর একটি সুন্দর ছবি 'ম্যাজিক বয়'। ডিসনির বহু বড় ছবি আমরা অনেকদিন থেকেই দেখে আসছি, যেমন, স্নো-হোয়াইট, পিটার প্যান, সিণ্ডারেলা, ফ্যাণ্টাসিয়া ব্যাম্বি ইত্যাদি। দেশ-বিদেশের রূপকথা আর Fairy tales প্রায় উজাড় করে ফেললো ওরা। এ যুগের লেখা নতুন রূপকথা ও আজগুবি কাহিনীর তো শেষ নেই। যেমন 'দি রিলাক্ট্যাণ্ট ড্রাগন' আর সোভিয়েটের 'মিলিয়ন ইন এ ব্যাগ'। আরো কত। জীবজন্তুর কাহিনীকে অভিনব রূপ দিয়েছে ওরা। হাঁস মুরগী বেড়াল কুকুর হরিণ হাতী শিয়াল তো আছেই। ফড়িংবাবু আর পিঁপড়েদের আমরা দেখেছি একটি অপূর্ব ছবিতে। দৈত্য দানব জিনি যেমনি ভয়ঙ্কর তেমনি কৌতুককর। দুষ্টু পরী লক্ষ্মীপরী বেঁটে বামন ছোট ছোট elf এদের নিয়ে কত গল্প কত ছবি। আণুবীক্ষণিক জীবরা এখন স্বচ্ছন্দে

নায়ক হয়ে পর্দায় দেখা দিতে পারে। পৃথিবী ছাড়িয়ে দূর শূন্যপথে ছুটেছে ওদের কল্পনা—চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহেও চলেছে ওদের গল্পের অভিযান।

ছোটদের জন্যে আমার মনে হয়, আমরা কিছুই করছি না। নিজেরা ছবি করতে না পারি অন্তত: বিদেশী ছবি দেখানোও ভালো। কার্টুন আর পাপেট ফিল্মে যে আজগুবিত্ব আছে তাই দেখে ছোটরা একটু মজা পাক। প্রাণ খুলে হাসুক তারা। অসম্ভবের রাজত্বে টেনে নিয়ে যাক তাদের কল্পনাকে। উদ্ভট কিছু কিছু আসুক তাদের অভিজ্ঞতায়। তা'না হলে চেঁচিয়ে হাসবার শক্তি কমে যাবে তাদের।

আর যতদিন না আমরা এই ধরণে আমাদের নিজেদের ছবি তৈরি করতে না পারছি ততদিন আমাদের দেশের রূপকথা পঞ্চতন্ত্র আর পুরাণ কাহিনী ছাপার অক্ষরেই থাক। যতদিন না আমাদের শিশুসাহিত্যের নায়করা পর্দায় নামার সুযোগ না পায়, ততদিন ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী গাছের ডালেই বসে থাকুক। ডালিমকুমাব নৌকো বেয়ে চলুক। রাক্ষসপুরীতে রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকুক আর হুঁকোমুখো কুমড়োপটাসরা শুধু আবোল তাবোল বকতেই থাকুক।



এই প্রসঙ্গে কার্টুনিষ্ট হিসাবে জানাই, একটী মাসিকপত্র যে কার্টুনের প্রচারকল্পে একটী বিশেষ সংখ্যা ছাপার আয়োজন করেছে এটী আমাদের দেশে অভূতপুর্ব ঘটনা।

আশার কথা আমরা কার্টুনের আঁকাবাঁকা রেখান্বিত পথে হাসতে হাসতে অগ্রসর হচ্ছি—শুধু তুলে ধরতে হবে একটা ফেষ্টুন, তাতে লেখা থাকবে 'GROW MORE CARTOONS'.

—শৈল চক্রবর্তী

কার্টুনিষ্টের দায়িত্ব

হিমানীশ গোস্বামী

ব্যঙ্গচিত্র কাউকে না কাউকে আক্রমণ করবেই। কোন না কোন ভাবে সামাজিক ব্যবস্থাকে তার আক্রমণের লক্ষ্য হতেই হবে। অর্থাৎ কার্টুনিষ্ট হচ্ছে একজন যোদ্ধা, তার শত্রু অসংখ্য, কারণ সে অপ্রিয়ভাষী। এই অপ্রিয়-ভাষিতার স্বাধীনতা যদি তার না থাকে তাহলে সে সত্যিকারের কার্টুনিষ্ট হতে পারে না।

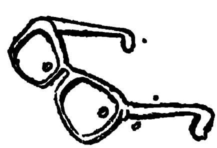
কবি এবং অন্যান্য কলমধরা শিল্পীদের এই স্বাধীনতা বেশ কিছু আছে। এতে একটা সুবিধে হয় এই যে অধিকাংশ সময়েই আক্রমণটা যার বিরুদ্ধে (যদি আক্রমণ থাকেই) সে ঠিক সেই লেখাটা না'ও পড়তে পারে। পড়লেও বুঝতে না'ও পারে। এতে নিজস্ব রাগ প্রকাশ হয় বটে, এবং কিছু কিছু বন্ধু-বান্ধব তা নিয়ে বাহবা দিতেও পারে বটে, কিন্তু তার আর কিছু এসে যায় না। অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে আক্রমণ, তাকে জবাবদিহি করতে হয় না। কার্টুনিষ্টকে কিন্তু স্পষ্ট হতেই হবে। যতখানি স্পষ্ট হওয়া যায় ততখানিই সে কার্টুনিষ্ট সার্থক হতে থাকে। সমসাময়িক ঘটনাকে চিত্ররূপ দেওয়াই কার্টুনিষ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। খবরের কাগজে বা মাসিক সাপ্তাহিক পত্রে গল্পের সঙ্গে কেউ কেউ ভাল ছবি দিয়ে গল্পটাকে সাজান। এতে এই সাজানোর ভার যাঁরা নেন তাঁদের নিজস্ব দায়িত্ব কিছু বিশেষ থাকে না। একজন সাইকেল করে যাচ্ছে এবং সে সিগারেট খাচ্ছে এটা দেখানোর জন্য শিল্পীকে ভার দেওয়া হয়। শিল্পী তার রূপ দেন। কেউ ভালভাবে সে ছবিটা আঁকেন, কেউ হয়ত অনভ্যাসের জন্য বা কম অভিজ্ঞতার জন্য সে ছবিটা তত ভাল আঁকতে পারেন না। কিন্তু তিনি যত ভালই আঁকুন না কেন তার জন্য তাঁকে কখনো জবাবদিহি করতে হয় না। তিনি যে দৃশ্যই দেখান না কেন, তা তাঁর সৃষ্ট দৃশ্য নয়। তিনি অন্যের আইডিয়াকে রূপ দেন মাত্র।

আধুনিক কালে অধিকাংশ ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পীরই এই দুর্দশা। কোন একটা বিশেষ কাগজের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, অতএব সেই বিশেষ

দৃষ্টিভঙ্গীকে রূপ দিতে যে কার্টুনিষ্ট যত সফল হবে তার সমাদর সেখানে ততই বেশি হবে। কার্টুনিষ্টের ব্যক্তিত্ব এতে অনেক সময়েই প্রতিফলিত হয় না। আজ অ্যামেরিকা রকেট এবং মহাশূন্যের ব্যাপারে রাশিয়ার কাছে পিছিয়ে আছে—এটা ঘটনা। ঘটনাকে রূপ দেওয়া যে কোন কার্টুনিষ্টের পক্ষেই সম্ভব। এই কার্টুনগুলো নিয়ে কোন আলোচনার অবকাশ নেই। অর্থাৎ ঘটনাটা এতই সত্যি যে এটা যে কোন কাগজে (অ্যামেরিকান সরকারী কাগজ ছাড়া) নিশ্চিন্তভাবেই ছাপা চলতে পারে। রাশিয়ান কাগজে তো এ কার্টুন ছাপা হবেই। কিংবা আফ্রিকা জাগছে, আফ্রিকার সিংহ ঘুম থেকে উঠছে এবং তার বন্দীত্বের শেকল কামড়াচ্ছে, এটাও সত্যি ঘটনা এবং এটাও যে কোন কার্টুনিষ্ট আঁকতে পারে, অর্থাৎ কিনা যে কার্টুনিষ্ট সিংহ আঁকতে পারে।

সত্যি সত্যি গোলমাল হয় সরাসরি আক্রমণ করলে। এরকম সাহস আমাদের দেশের কোন কার্টুনিষ্টেরই নেই বা বাধ্য হয়ে তাদের বর্তমান অবস্থাকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় আমাদের কার্টুনিষ্টদের ব্যক্তিত্বের অভাব আছে।

ছবি অনেকেই আঁকতে পারে—মানুষকে নানা রকম মুখভঙ্গীও করানো সহজ ছবির খাতায়। তেমনি অনেকেই লিখতেও পারে, কিন্তু লোকে কি লেখে এবং কি আঁকে সেটাই দ্রষ্টব্য।



সংবাদপত্রে কার্টুন

চণ্ডী লাহিড়ী

কার্টুন ঠিক কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। এবং মজার কথা পণ্ডিতদের মধ্যে, যতই তর্ক হোক না কেন তাঁরা কেউ কার্টুন আঁকেন না। কার্টুন যিনি আঁকেন তিনি নিজের বিচার-বিবেচনা রুচি, শিক্ষা, ড্রইং জ্ঞান অনুযায়ী আঁকেন। কারণ মনন-চিন্তন যাই হোক না কেন, প্রকাশভঙ্গীই হল আসল জিনিস। প্রায়ই বিভিন্ন বন্ধুরা অযাচিতভাবে কার্টুনের আইডিয়া দেন, যার শতকরা নিরানব্বইটিই আমার কাছে দুর্বোধ্য। অথবা আইডিয়া নিখুঁত হলেও —সেটাকে ছবির ভাষায় প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়। যে বক্তব্য শিবরামদার 'অল্পবিস্তরে' কথার প্যাঁচে সহজে প্রকাশ করা যায়, সেটা 'তির্যকে' শত চেষ্টাতেও সহজে আঁকা যায় না।

কার্টুন কথাটির অভিধানগত অর্থ হল Rough Sketch, ছবি নয়, ছবির খসড়া। অযত্নকৃত এই সব ছবির ড্রইং হাস্যকর বা উদ্ভট হওয়া স্বাভাবিক। কারও হয়ত কান বড়, কারও নাক খাঁদা, কারও মাথায় সাহারা প্রমাণ টাক। Rough Sketch করতে গিয়ে শিল্পী আগে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আঁকতেন, তারপর ধীরে ধীরে detailed drawing করে ছবিতে পূর্ণতা দিতেন। প্রথমকার Rough Sketchগুলি অবশ্যই হাস্যোদ্রেক করত। তার থেকেই এসেছে আজকার কার্টুন। অবশ্য প্রথম দিকে কার্টুন ছিল প্রধানত: ড্রইংনির্ভর, আইডিয়ার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। এখনকার দিনে আইডিয়াবর্জিত কার্টুনের কথা কেউ ভাবতেই পারে না। এই আইডিয়াটিকে বাগাবার জন্য কার্টুনিষ্টের চেষ্টার ত্রুটি নেই। ট্রামে-বাসে পথ চলতে, বাবুদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করতে করতে, বাজারে পোনা মাছের দর কষতে কষতে এবং বিয়ে বাড়িতে চর্ব্যচুষ্য গলাধঃকরণ করতে করতে তাঁকে আইডিয়ার কথা ভাবতে হচ্ছে। ইংরেজীতে এই আইডিয়াকে মাইডিয়ার করার নাম দেওয়া হয়েছে Wooing the Muse.

ভাবতে হয় বৈকি। যা কিছু ভাবনা আগে ভাগেই ভেবে নিতে হয়। নৈলে পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়ার পর এক লক্ষ পাঠকের প্রতি-

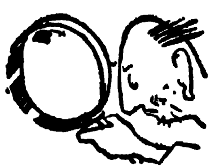
জনের দরজায় হাজির হয়ে, 'মহাশয়, অত্র প্রকাশিত ব্যঙ্গচিত্রের মর্মার্থ হল এই যে...' বলে বুঝিয়ে আসা সম্ভব নয়। কার্টুনের ব্যাপারে শিল্পী নিজেই চিত্রকর, নিজেই বিচারক। বার্তা-সম্পাদকের ঝুঁকি আরও বেশি। পত্রিকার ভাল মন্দের দায় দায়িত্ব সব তাঁর। কেবল পাঠকদের কথা ভাবলেই তাঁর চলে না, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা তাঁকে চিন্তা করতে হয়। একটি কার্টুন আপাতদৃষ্টে কেবল হাসির ব্যাপার হলেও অন্যত্র হয়ত সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগাতে পারে। হয়ত দেশের প্রধান মন্ত্রীর কোন কাজের সমালোচনা কার্টুনে করা হলো। বাহ্যদৃষ্টে নির্দোষ হলেও হয়ত দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে তিনি হেয় বা ঘৃণ্য প্রতিপন্ন হতে পারেন সেই ছবির মারফৎ। বার্তা-সম্পাদককে সর্বদাই সেবিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। তাছাড়া সম্পাদকীয় নীতির সঙ্গে কার্টুনিষ্টের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌল ঐক্য থাকা বাঞ্ছনীয়। বার্তা-সম্পাদককে সেই ঐক্যসূত্র রক্ষা করে চলতে হয় বলে তাঁর দায়িত্বই সর্বাধিক।

কার্টুন Humour for humour's sake হওয়া বাঞ্ছনীয় স্বীকার করি। কিন্তু যেখানে জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে নিছক মস্করা করে সব ব্যাপারটি জনতার কাছে লঘুভাবে পরিবেশন করা উচিত নয়। বেরুবাড়ী হস্তান্তরের প্রশ্নটি দিল্লীর কার্টুনিষ্টরা উপেক্ষাভরে দেখতে পাবেন কিন্তু বাংলা দেশের শিল্পী হয়ে আমি নিছক রসিকতা করে উড়িয়ে দিতে পারি না। সেক্ষেত্রে কার্টুন একটু আক্রমণাত্মক হবেই। কলকাতার কোন সংবাদপত্রই বিষয়টিকে লঘুচিত্তে দেখেন নি, বাঙ্গালী কার্টুনিষ্ট হয়ে আমার পক্ষেহ বা তা সম্ভব কি করে? এ বিষয়ে বিলেতের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে কেউ কেউ Humour for humour's sake প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের জানা উচিত, ভিকি বা ডেভিড লো ইংরেজ নন, এমন কি স্কচও নন। তাঁরা অন্য দেশ থেকে বৃটেনে এসেছেন পয়সা রোজগার করতে। ইওরোপীয়ান কমন মার্কেটের ব্যাপারটি তাঁরা লঘু দৃষ্টিতে দেখেছেন। দেখা সম্ভব। কিন্তু খাঁটি ইংরেজ ফ্রাঙ্কলিন তা পারেন নি। তাঁর কাছে বিষয়টি জীবন মরণের প্রশ্ন।

এতদিন পর্যন্ত বাংলা দেশের সংবাদপত্রগুলিতে কার্টুনই প্রকাশিত হতো। গত জুন মাস থেকে প্রথম পৃষ্ঠায় কলম কার্টুনের (নামান্তরে পকেট কার্টুন) প্রচলন হয়েছে। এই অতিক্ষুদ্র অথচ ক্ষমতাশালী

কার্টুনের জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। রাজনৈতিক কার্টুন সর্বশ্রেণীর পাঠককে খুসী করতে পারে না। কিন্তু কলম কার্টুনের রসগ্রহণ করতে কারো বাধা নেই, তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্যাগুলিকে এই সব কার্টুনের আওতায় আনা যায়। এই সব কার্টুন এক হিসাবে জীবনের দর্পণ। যাঁদের প্রতি ব্যঙ্গ করে এই সব ছবি আঁকা হয়—তাঁরাও অনেক সময় লজ্জায় নিজেদের ভুলত্রুটি সংশোধন করে নেন এমন নজীর আছে। অন্ততঃ 'ভির্যকের' ক্ষেত্রে জানি, বিভিন্ন সরকারী মহল নিজেদের ত্রুটি সাধ্যমত সংশোধন করেছেন। অবশ্য অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনাও থাকে। একটি ঘটনার কথা বলি। অনেক গৃহস্থ কুকুর পোষেন পাওনাদার তাড়াবার জন্য। ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোঃর কর্মীরা বাড়িতে মীটার পরীক্ষা করতে যান, কিন্তু গৃহস্থের বাড়িতে কুকুর আছে বলে দূর থেকে চোখে দূরবীণ লাগিয়েই তাঁরা কাজ সারেন। বলাবাহুল্য, গৃহস্থের কুকুব পোষার উদ্দেশ্য যে অসাধু, বিদ্যুৎ-কোম্পানীকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যই তাঁরা কুকুর পোষেন এই কথাটা কার্টুনে বলা হয়েছিল। কটাক্ষ ছিল গৃহস্থের প্রতি, কিন্তু ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর কর্মীরা ভাবলেন তাঁদেরকেই আক্রমণ করা হয়েছে। দল বেঁধে একদিন আনন্দবাজার পত্রিকার কার্যালয়ে এসে হাজির হলেন তাঁরা।

পরবর্তী ঘটনার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।



বিজ্ঞাপনে ব্যঙ্গচিত্র

সন্তোষকুমার দে

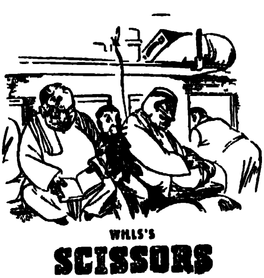
বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যই যখন পাঠক এবং দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তখন কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র ব্যবহার করলে বিজ্ঞাপন যে সহজেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এসত্য মানুষ বহুদিন আগেই আবিষ্কার করেছে। লিখিত বা চিত্রিত বিজ্ঞাপন সুরু হওয়ার আগেও রঙ্গ-ব্যঙ্গ-তামাসা দিয়ে প্রচার কার্যে সুফল পাওয়াব দৃষ্টান্ত বিরল নয়, আজও তার রেশ রয়েছে ফিরিওয়ালাদের বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে মজাদার ছড়া কাটতে কাটতে ঝাল ডালমুট কিম্বা দাঁতের মাজন বিক্রি কবার মধ্যে। সার্কাসের তাঁবুর সুমুখে ক্লাউনের ভাঁড়ামিতে ভিড় জমিয়ে খদ্দের জোটানোও এই পর্যায়ের দৃষ্টান্ত।



বিজ্ঞাপনের ছবিতে ব্যঙ্গচিত্র সকল দেশেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে আমাদের দেশে অতীতেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও হবে এবং বেশি পরিমাণে হবে বলেই মনে হয়। 'দন্তবল' দাঁতের মাজনে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দন্তবিকাশ দীর্ঘকাল আমাদের সুমুখেই রয়েছে। ক্লাউনের ছবি দিয়ে নিজ-নিজ পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া এক সময় খুব চলত, তাই তৈরি ব্লকের তালিকায় ক্লাউনের নানা আকারের ছবির দর্শন মেলে। সম্প্রতি 'ইউনাইটেড টায়ার' নামক প্রতিষ্ঠানে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় নিয়মিত যে অদ্ভুত দর্শন মূর্তিটির সাক্ষাৎ মেলে তাও ক্লাউনের আধুনিক সংস্করণ বললে নেহাৎ ভুল হয় না। মোটর টায়ার প্রসঙ্গে আর একটি মূর্তির কথা মনে পড়ছে—এক সময়ে টায়ারের বিজ্ঞাপনে সেই মানুষটিকে সর্বত্র দেখা যেত—যার গোটা শরীরটাই মোটা মোটা ছোট-বড় টায়ার পরপর সাজিয়ে তৈরি। মেলিনস্‌ ফুডের বিজ্ঞাপনে

নধর কান্তি শিশুর মূর্তিটি যেমন বিখ্যাত ছিল—তেমনি ছিল ঐ টায়ারের বিজ্ঞাপনে টায়ার মানুষটি। (যত দুর মনে পড়ছে—নাম ছিল বোধহয় মিসিলিন্ টায়ার)। রং-এর বিজ্ঞাপনে একটি দুষ্টু ছেলে ঘরের দেওয়ালে এক পোচড়া ঘন রং বুলিয়ে বলছে—Now they 'll have to distemper it. তখন প্লাষ্টিক ইমালসান আবিষ্কৃত হয়নি—দেওয়াল ডিসটেম্পার করাই ছিল সৌখিনতা এবং তা জনপ্রিয় করতে কাজে লাগানো হয়েছিল—ঐ দুষ্টু ছেলেটিকে। এখনও 'এশিয়ান পেইনটস্'-এ একটি হুড়োমুড়ো চুল, দুরন্ত বালককে তুলি ধরিয়ে দিয়ে বলা হয়—যে কোন জমির ওপর রং বোলাতে চাই—এশিয়ান পেইন্টস্।

আমাদের দেশে রুচিশীল ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যঙ্গচিত্রীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য 'পিসিএল' (Piciel) বা প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী। প্রায় পঁচিশ বছর আগে তিনি সিরোলিন (রচি)-র বিজ্ঞাপনে এক আসামী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কাশছে দেখে বিচারপতিকে দিয়ে রায় দিয়েছিলেন—'সিরোলিন' খেতে। ছবিগুলি খুবই ভাবব্যঞ্জক হয়েছিল। পিসিএল্ পর পর কয়েকটি অনুকুলচন্দ্র মুখার্জির শাড়ী ও কাপড়ের বিজ্ঞাপনে, গাঙ্গুরামের সন্দেশের বিজ্ঞাপনে এবং একটী জুয়েলারের প্রহরত্নের বিজ্ঞাপনে ব্যঙ্গচিত্র অতি সফলভাবে ব্যবহার করেছেন। 'বাঃ, তোমাকেও কি চমৎকার মানিয়েছে'—'বিষয়ীদের শাড়ী কাপড় পিসিএলের হাতের ব্যঙ্গচিত্রে সত্যই আকর্ষণীয়।

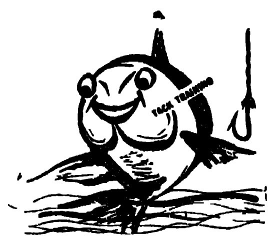


'আপনি কি হারাইতেছেন তাহা আপনি জানেন না'—এই পর্যায়ে সিজার্স সিগারেটে যে ব্যঙ্গচিত্রগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল তা সত্যই অপূর্ব। ছবিগুলির চমৎকারিত্বের জন্যই বিজ্ঞাপনের ক্যাপসানটীও মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছে।

'আপনি কি হারাইতেছেন'—প্রসঙ্গে একটী কথা মনে পড়ল। বিশ্ববিখ্যাত দুটী বিজ্ঞাপনের ব্যঙ্গরূপ রাজনৈতিক মহলেও খুব পরিচিত, তার একটী হল 'জানি ওআকার' মদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত মূর্তিটীর বিশেষ ভঙ্গিমায় পদক্ষেপ ক্যাপসান—'Born in 1870. still going

strong.' অপরটি His Master's Voice—কুকুর গ্রামোফোন যন্ত্রে প্রভুর স্বর শুনছে। এই ছবিটিকে নানাদেশে নানাভাবে রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রের উৎস হিসাবে কাজে লাগানো হয়েছে। বার্মাশেল-এর বিজ্ঞাপনে পি-এন-শর্মা অঙ্কিত একটি দুরন্ত অত্যাচারী ইঁদুরের (cuthrat) নানাভাবে জব্দ হওয়ার কাহিনী এবং ইদানীং বুদ্ধিমান মোটর চালকের ফিগার ড্রইংগুলি উচ্চাঙ্গের ব্যঙ্গচিত্র। ক্যারিয়ার শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র বিজ্ঞাপনে 'বোমাস' ব্যঙ্গচিত্র ব্যবহারে নিপুণতা দেখিয়েছেন। ষ্ট্যানভ্যাক্ (অধুনা ESSO)-এর নবনির্মিত বোম্বাই-এর অফিস বাড়িটি ক্যারিয়ার কর্মীরা কাঁধে তুলে নিয়ে চলেছে—অর্থাৎ গোটা বাড়ির ভার (load) বহন করছে।

অত্যাধুনিক বিজ্ঞাপনের চিত্রে বাস্তবতা (realism) অপেক্ষা ভাবপ্রবণতা (abstract) বেশী প্রভাব বিস্তার করছে এবং ঐ এবষ্ট্রাক্ট আর্টের ধড়াচুড়া পরে বহুল পরিমাণে ব্যঙ্গচিত্র আসর জমিয়ে বসছে। তাই মনে হয়, এযুগে একদিকে যেমন বিজ্ঞাপনে ছায়া চিত্রের ব্যবহার ক্রমেই বেশী হচ্ছে, তেমনি বেশী হচ্ছে ব্যঙ্গচিত্রের ব্যাপক ব্যবহার। তাই ডেভিড লো কিম্বা 'পিসিএল' এখন যদি রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রের মতই বিজ্ঞাপনেও ব্যঙ্গ সংযোগ করেন তাতে আর আমরা আশ্চর্য হই না। বিজ্ঞাপনও এখন বেশ রসিয়ে পড়বার মতই হয়ে উঠেছে আর তাতে ব্যঙ্গশিল্পীর দান নিঃসংশয়ে স্বীকার্য।


The one that gets away..

এদিক দিয়ে তাঁদের আর্থিক-ভবিষ্যতও উজ্জ্বলই মনে করি।

বি দ্রঃ—এই প্রবন্ধের ছবি তিনখানি যথাক্রমে দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে, ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোং ও ট্যাক ট্রেনিং (সেলস্‌-ম্যানশিপ) প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন-চিত্র থেকে গৃহীত।

★

তোমরা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

অনেক ব্যথার রং মেখে নিয়ে ওই দুটি চোখে
সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে সৃষ্টি কর কঠিন বাস্তব
সমাজ সংসার আর জীবনের অন্য এক রূপ—
রূপায়িত যন্ত্রণায় তোমাদের তুলির চাবুকে

যেখানে অসত্য আর কদর্যের কাদা মাখামাখি
পঙ্কিল হাওয়ায় ভাসে যেখানেই গন্ধ-গুমোট
বক্রদৃষ্টি ফেলে কটাক্ষের তুলির আঁচড়ে
সত্যকে প্রকাশ কর অসত্যকে বিক্ষত করে

হাতে শুধু তুলি নয়, মনে আছে মার্জনা-প্রয়াস।
তুলিই সম্মার্জনী। পূতিগন্ধ আবর্জনা যত
ঢেকে দিতে উদ্যত স্পর্দ্ধা'ভরে যা কিছু সুন্দর
তোমরা সুদৃঢ় হস্তে অবরোধ কর তার গতি।

সংসারের কর্তাবাবু রাষ্ট্রের কর্ণধার আর
সমাজের মাথা থেকে স্বর্গের দেবতারা যত
তোমাদের জাতটাকে বড় ভয়, তটস্থ সকলে
গুষ্টি ধরে শ্রাদ্ধ কর একথাও অবিদিত নয়।

তোমরা শিল্পী-শ্রেষ্ঠ তোমাদের তুলির লেখায়
আনন্দই শুধু নয় তার নীচে কান্না লুকোনো
কেউ বা আনন্দ পায় কেউ কেঁদে লুটায় মাটিতে
বিচিত্র রসের লীলা তোমাদের জীবন-তুলিতে।

*